GIFT

বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠী
-একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

465270

Dhaka University Library
465270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
দিলরুবা আক্তার
রেজিষ্ট্রেশন নং-২৬৫
সেশন ঃ ২০০৩-০৪
এম.ফিল.
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.

465270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা

465270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ জাহিদুল ইসলাম
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
দিলরুবা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নং-২৬৫
সেশন ঃ ২০০৩-০৪
এম.ফিল.
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য "বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠী- একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা" এই শিরোনামে উপস্থাপিত গবেষণাটি বা এর অংশ বিশেষ ইতোপূর্বে কোন পত্রিকা বা অন্য কোথাও ছাপানো হয়নি এবং কোন ডিগ্রীর জন্যও দেয়া হয়নি।

465270

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ জাহিদুল ইসলাম

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

দিলরুবা আক্তার

রেজিষ্ট্রেশন নং- ২৬৫

সেশন: ২০০৩-০৪

এম.ফিল.

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

নৃবিজ্ঞান সুশৃঙ্খলভাবে মানবজাতি এবং এর সমাজ ও সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করে থাকে। এই জ্ঞান অন্বেষনের একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হচ্ছে গবেষণা। বর্তমান গবেষনাটির মাধ্যমে আন্তরিক ও অধ্যবসায়ের সাথে একটি সত্যকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কতগুলো অনুকুল্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল পাঠ পরিক্রমের অংশ হিসাবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটির শিরোনাম "বাংলাদেশের বম আদিবাসী- একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা"। দশটি অধ্যায়ে গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুকল্প, গুরুত্ব, সীমাবদ্ধতা এবং সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গবেষণা পদ্ধতি, গবেষনার নকশা, সংখ্যাগত তথ্য, গুনগত তথ্য, স্থান নির্বাচন, ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহ, তথ্য সংগ্রহ কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের বম আদিবাসীর পরিচিতি, সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত, ভৌগলিক পরিবেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে সমাজ ও সামাজিক সংগঠন সমুহ যেমন- পরিবার, বিবাহ, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা। পঞ্চম অধ্যায়ে জুম ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পেশার বিভিন্নতা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বম সমাজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে বম সংস্কৃতির শিল্প ও চারুকলা, জীবনের সন্ধিঃক্ষন সংক্রান্ত আচার ও আনুষ্ঠানিকতা। অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব, মিথ এবং যাদুবিদ্যা। নবম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীদের সমস্যা ও কিছু সম্ভাবনাসমূহ এবং দশম অধ্যায় উপসংহারে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণা প্রেক্ষাপটে গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং এর সারাংশ। এই গবেষণা কর্মটি এম.ফিল পাঠ্যক্রমের জন্য নির্ধারিত এবং আমার ক্ষেত্র গবেষনার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলাফল। এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যারা আমাকে সাহায্য, সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের সহযোগীতা না পেলে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ জাহিদুল ইসলাম এর কাছে। সময়ে-অসময়ে যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি সব সময়ই তিনি সাহায্য সহযোগীতা করেছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী কে, যিনি সব সময়ই মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ডঃ আহ্সান আলী এবং অধ্যাপক ডঃ এইচ কে এস আরেফিন কে যারা সবসময়ই মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বান্দরবান জেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য জুমলিয়ান আমলাই ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি। তারা বিভিন্নভাবে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেছে। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বান্দরবান জেলার বম আদিবাসীদের কাছে যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমার তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ শুভানুধ্যায়ীদের কাছে, তাদের পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগীতা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল থাকলে তার দায়ভার একান্তই আমার।

দিলরুবা আক্তার

তাং ৩০-১১-২০১১

দিলরুবা আক্তার

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

বাঙালীঃ	সাধারণভাবে এরা বাংলা ভাষাভাষী বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী।
সিসিডিবিঃ	বাংলাদেশের উন্নয়নে কার্যরত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।
চিফঃ	পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলের প্রধান।
সিএইচটিঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম।
সার্কেলঃ	এই সার্কেলগুলো হচ্ছে চাকমাসার্কেল, মং সার্কেল ও বোমাং সার্কেল।
সার্কেল চীফঃ	সার্কেলের প্রধান বা রাজা।
গ্রামঃ	গ্রামীন বসতি।
এইচ.ডি.সি	পাহাড়ী জেলা পরিষদ।
হেডম্যানঃ	প্রথাগতভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মৌজা প্রধান বা রাজা।
জুমঃ	কৃষি পদ্ধতির একটি ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র পাহাড়ী অঞ্চলেই সম্ভব হয়। যারা জুম চাষ করে তাদেরকে জুমিয়া বলে।
কারবারীঃ	গ্রাম অথবা পাড়া প্রধান। কারবারী গ্রাম বা পাড়ার সাধারণ সমস্যাসমূহ সমাধান করে।
লুঙ্গিঃ	পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র।
মাচাংঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ের উপরে তৈরি বসতবাড়ী।
মৌজাঃ	প্রশাসনিকভাবে সর্বনিম্ন ইউনিট। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি মৌজা একের অধিক গ্রাম বা পাড়া গিয়ে গঠিত।
এম.পিঃ	সংসদ সদস্য।
পাড়াঃ	এটি একটি গ্রাম। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের একটি অংশ। অন্যভাবে কতগুলো গুচ্ছভাবে বসবাসরত কতক বসতবাড়ী যেগুলোর একটি হতে অপরটির দুরত্ব অনেক কম।
RCঃ	রিজিওনাল কাউন্সিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	ii-iii
পরিভাষা	iv
সারণীর তালিকা (১-১০)	৪৪-৫০
প্রথম অধ্যায়	১-২০
ভূমিকা	
গবেষণার যৌক্তিকতা	
গবেষণার উদ্দেশ্য	
গবেষণার গুরুত্ব	
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	
সাহিত্য বিষয়ক পর্যালোচনা	
দ্বিতীয় অধ্যায়-গবেষণা পদ্ধতি	২১-৩৩
ভূমিকা	
গবেষণা নক্শা	
স্থান নির্বাচন	
ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহ	
তথ্য সংগ্রহ কৌশল	
তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল	
মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা	
তৃতীয় অধ্যায়-ভৌগলিক ও ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থা	৩৪-৫০
বোম নৃগোষ্ঠী	
বোম নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত	
বোম নৃগোষ্ঠীর ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রতিবেশ	
চতুর্থ অধ্যায়-সমাজ ও সামাজিক সংগঠন	৫১-৬৯
ভূমিকা	
গোত্র ভিত্তিক সমাজ	
পরিবার	
উত্তরাধিকার ব্যবস্থা	
জ্ঞাতিসম্পর্ক	
বিবাহ ব্যবস্থা	
চিকিৎসা ব্যবস্থা	
শিক্ষা ব্যবস্থা	

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা
খাদ্যাভাস
পোশাক পরিচ্ছদ
গার্হস্থ্য সামগ্রী
বিচার ব্যবস্থা

পঞ্চম অধ্যায়-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠন ৭০-৭৫
জুম চাষ ও অর্থনীতি
বাজার ব্যবস্থা
পেশার বিভিন্নতা

ষষ্ঠ অধ্যায়-রাজনৈতিক সংগঠন ৭৬-৭৮

সপ্তম অধ্যায়-বোম সংস্কৃতি ও সংগঠন ৭৯-৮৭
বোম সংস্কৃতি শিল্প ও চারুকলা
বোমদের বাৎসরিক উৎসব
জীবনের সন্ধিক্ষন সংক্রান্ত আচার ও আনুষ্ঠানিকতা

অষ্টম অধ্যায়-ধর্ম সংগঠন ৮৮-৯২
ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসব
প্রচলিত মিথ
যাদুবিদ্যা

নবম অধ্যায়-বোম সমাজের অনগ্রসরতা ও উন্নয়ন ৯৩-১০১
কেস ষ্টাডি

দশম অধ্যায়ঃ ১০২-১১১
উপসংহার
গ্রন্থাবলীর তালিকা
পরিশিষ্ট-ক-বোম শব্দের তালিকা
পরিশিষ্ট-খ-আলোকচিত্র ১১২-১১৩
১১৪-১২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি সবুজ শ্যামল, নদী মাতৃক ও জনবহুল ছোট দেশ। এর ভৌগলিক অবস্থান ২০°৩৪´ হতে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১´ থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ (শহীদুল্লাহ, ২, ২০০৬)। এদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৬৮৫ কিঃমিঃ যার মধ্যে ৭১২ কিঃমিঃ সামুদ্রিক উপকূল এবং ৩৬৯৪ কিঃমিঃ ভারতের এবং ২৭৯ কিঃমিঃ মায়ানমারের সীমান্ত সংলগ্ন (প্রাগুক্ত, ২, ২০০৬)। এদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলোতে প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করে আসছে। এদেশের ইতিহাসে বাঙালীদের পাশাপাশি চাকমা, গারো, সাঁওতালসহ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংগ্রামের ঐতিহ্য মিশে আছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ তথা বাঙালী জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে যেমন রয়েছে ধারাবাহিক ইতিহাস তেমনি রয়েছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মিথষ্ক্রিয়া। নৃবিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য জেলাগুলোর পাহাড়, ঝরনা, জলপ্রপাত, পাহাড়ী সর্পিল খাল, নদী, হ্রদ, গভীর অরণ্য ও সামান্য সমতল ভূমি রয়েছে যেখানে বসবাস করে ১২টি আদিবাসী সমাজ। এগুলো হচ্ছে ১) চাকমা ২) মারমা (মগ) ৩) ত্রিপুরা (টিপরা) ৪) তঞ্চঙ্গ্যা (ঠফন্যাফ) ৫) ম্রো (মুরং) ৬) বোম (বানযুগী) ৭) উঁচই ৮) পাংখোয়া ৯) খিয়াং ১০) খুমি ১১) লুসাই ১২) চাক্ (বাতেন, ৮, ২০০৩)।

'বোম' নৃগোষ্ঠীটি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। উক্ত জেলায় পাহাড়ি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে। এরা দূর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করলেও অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বম নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৭৭ জন। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৮১ সালে আদমশুমারি মতে বোম জনসংখ্যা সর্বমোট ৬০৪৯ জন। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এদের সংখ্যা ৬৯৭৮জন। ১৯৯৮ সালে বোমদের নিজস্ব সংগঠন "বম সোস্যাল কাউন্সিল" নামক সংগঠনটি তাদের পরিসংখ্যানে সর্বমোট জনসংখ্যা ১০,০০০ জন বোম জনসংখ্যা বলে উল্লেখ করে (Loncheu, P 2, 2003)। আদমশুমারী

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্ট ২০০১ অনুসারে বর্তমানে বম জনসংখ্যা সর্বমোট ১৩৫০০জন। 'বোম' জনগোষ্ঠী বান্দরবানের রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর থানার পাহাড়ী গ্রামগুলোতে 'বোমপাড়া' বা গ্রাম তৈরি করে বসবাস করে। এছাড়া রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি থানাতেও বোমদের দু'একটি গ্রাম রয়েছে। ধারনা করা হয় সর্বমোট ৭০টি বোম গ্রাম রয়েছে। গ্রাম বলতে নৃবিজ্ঞানী Baddn Powell তাঁর Origin and growth of Indian village communities গ্রন্থে গ্রামের সংজ্ঞায় বলেন, "গ্রাম হচ্ছে স্থায়ীভাবে বসবাসরত একটি সংগঠিত জনপদ যার চারপার্শ্বে রয়েছে জমিজমা, রাস্তাঘাট, গাছপালা সহ এক প্রাকৃতিক পরিবেশ, যার একটি স্থানীয়ভাবে প্রদত্ত একটি নাম এবং কয়েকগুচ্ছ ঘরবাড়ী"।

'বোম' শব্দের অর্থ হলো বন্ধন- পারস্পরিক সম্পর্ক একত্রীভূত বা একই শ্রেণীভূক্ত জনসমাজ। যার ফলে ক্ষুদ্র একটি জাতিসত্তা যাদের জীবনধারা, ভাষা, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, সংগীত, নৃত্য, উৎসব, পূজা-পার্বন, চাষবাস প্রায় একই রকম এবং যারা একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের চেয়ে সমষ্টিগত এবং যুথবদ্ধ জীবন যাপনকে বেছে নিয়েছে। প্রাচীনকালে বোমদের 'বানযুগী' বা কুকি হিসাবেও আখ্যায়িত করা হতো (Loncheu, P 2, 2003)। বোমরা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অরণ্যচারী, তাই শিক্ষার সাথে সম্পর্ক অনেক কম। অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত দূর্বল যা তাদেরকে সহজ সরল জীবনযাপনে বাধ্য করছে এবং সবসময় চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। ঐতিহ্যগত ভাবে বোমরা টোটেমবাদে বিশ্বাস করতো এবং এখনো তাদের মধ্যে এটি প্রবল। ডুরখেইম (১৯১২) এর টোটেমবাদ সম্পর্কিত ধারনাটি হচ্ছে অনগ্রসর সমাজের একধরনের ধর্ম ও সংস্কৃতির নাম যা আদি অস্ট্রেলিয় সমাজের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, তেমনি ফ্রয়েড (১৯৫০) তাঁর Totem and Taboo গ্রন্থে টোটেমবাদকে নৃবৈজ্ঞানিক উপাত্তের ব্যাখ্যায় মনোবিশ্লেষন হিসেবে দেখেছেন। নৃবিজ্ঞানী বোয়াস (১৮৯৬) বিশ্বাস করেন যে এটি প্রত্যেক সমাজের একটি সৃষ্টি যা ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত হয়। যদিও বর্তমানে বোমরা অধিকাংশই খ্রিষ্ট ধর্মে দিক্ষীত। এর ফলে বর্তমানে তাদের সমাজ জীবন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী হিসাবে 'বোম' নৃগোষ্ঠীর ভৌগলিক অবস্থান, জীবন ধারন পদ্ধতি তথা তাদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের উপর তেমন বেশী অধ্যয়ন নেই যা বোমদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। তাই গবেষনার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে "বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠী"- একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা। এ অধ্যয়নটি তাদের জীবন ইতিহাস,

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন সমূহের নানবিধ গবেষনা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। তার একটি অভিজ্ঞতা লব্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা নৃবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রয়াস মাত্র।

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রাথমিকভাবে, বোম নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর অদ্যবধি পূর্নাঙ্গ জাতিতত্ত্ব ও বস্তুনিষ্ঠ তেমন কোন গবেষনা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। বর্তমান অধ্যয়নে বোমদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা ও এর পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এই ক্ষুদ্র আত্মনির্ভরশীল,স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠীগুলো বর্তমানে তাঁদের প্রথাগত এবং ঐতিহ্যগত সমাজকাঠামো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হয়ে তারা বৃহৎ সমাজের সাথে অভিযোজনের ফলে একই সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের মৌল ও অধিকাঠামোর মাঝে নানা ধরনের ঘাত প্রতিঘাত বা দ্বন্দ দৃশ্যমান।

বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক ও সামাজিক আন্দোলন এবং আভ্যন্তরীন পরিবর্তনে তারা প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনসমূহ তাদের মানবিক সম্পর্ক এবং উপযোজনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমান সময়ে তাদের পরিবর্তনের প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, আন্ত র্জাতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও বিন্যাস এবং আধুনিক গণমাধ্যম, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভাব ইত্যাদি। বৃহৎ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অহেতুক ভয় এবং ঘৃণা থেকে তারা বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে তাদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য আভ্যন্তরীন সামাজিক আন্দোলন, অন্যদিকে তারা আন্দোলিত হচ্ছে আধুনিকায়ন এবং বৃহত্তর সংস্কৃতি দ্বারা। এই অবস্থাটি বোমদের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য তেমনি অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্যনীয়। সাধারণভাবে বলা যায়, সব সমাজের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহ একটি পরিবর্তনশীল একক। বাংলাদেশের বোম সমাজ এর ব্যতিক্রম নয়। বোমদের আছে নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আদর্শ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রভাবে অর্থাৎ আন্ত ও বহিঃশক্তির কারণে তাদের ঐতিহ্যগত নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং আদিসত্ত্বা বিলুপ্তির পথে। অন্য কথায় বলা যায়, তাদের অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র অন্তরায়ন, ঐতিহ্য এবং অন্যান্য পরিচয় আজ বহুমুখী প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন। এখন সময় এসেছে তাঁদের নথিপত্র, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং জীবন প্রণালীকে সংরক্ষণ করার জন্য একটি জাতি বস্তুনিষ্ঠ জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়ন। এই স্বতন্ত্র বোম সংস্কৃতিকে জানা এবং তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যগত জীবনধারা সংরক্ষনের জন্য এই নৃগোষ্ঠীকে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

অধ্যয়নটি 'বোম' জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি সমসাময়িক বাস্তব চিত্র প্রদান করবে। যেমন তাদের সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, আদর্শ, আনুষ্ঠানিকতা, লোকগাঁথা, লৌকিক উপাখ্যান প্রভৃতি। সন্দেহাতীতভাবে বিষয়গুলো এই স্বদেশজাত গোষ্ঠী সম্পর্কে, বিশেষত 'বোম' নৃগোষ্ঠীকে গভীরভাবে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, পাঠক ও গবেষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। অধ্যয়নটি খন্ডিতভাবে না দেখে পূর্নাঙ্গভাবে বিশ্লেষন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

মানুষের জানার, শিক্ষার, পর্যবেক্ষনের এবং আত্মস্থ করার অনেক বিষয় আছে। বর্তমান গবেষণাটির বিশেষ শিক্ষনীয় গুরুত্ব আছে যা জ্ঞান আহরনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এটি সবার মধ্যে স্বদেশীয় সহজ সরল মানুষদের সম্পর্কে জানা ও অন্তর্দৃষ্টিকোন থেকে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করবে এবং একই সঙ্গে তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়নকল্পে বিশেষ অবদান রাখতে সহায়ক হবে। বর্তমান অধ্যয়নটি বোম নৃগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য অনুধাবন করে তাদের বুঝতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা কিভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে যে বিষয়ের একটি সার্বিক বস্তুনিষ্ট নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে সহায়ক হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার অন্যতম বা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের 'বোম' নৃগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে একটি নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপনের ধরনের একটি চিত্র তুলে ধরা এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে এই গবেষণাটিতে নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে দ্রুত ঘটে যাওয়া এবং ঘটমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঐতিহ্যবাহী সমাজটি বর্তমান পরিবর্তনসমূহ গ্রহণ করে ক্রমশ জটিল সামাজিক কাঠামোর আবর্তে অগ্রসর হচ্ছে। এই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) বাংলাদেশের 'বোম' নৃগোষ্ঠীর জীবন প্রণালীর ধরন ও পরিবর্তন অনুসন্ধান করা

Dhaka University Institutional Repository

খ) বেদেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা

গ) পেশাগত বৈচিত্র্যতা ও রাজনৈতিক সংগঠনের ধরন

ঘ) পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতি সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ

ঙ) আবাসনের প্রকৃতি

চ) বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদের সম্পর্ক, সমাজ ও সংস্কৃতি কর্তৃক বাহ্যিক পরিবর্তনের প্রভাব।

গবেষণার গুরুত্ব

সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবে নৃবিজ্ঞানে সমাজ ও সংস্কৃতির গবেষনা ও অধ্যয়নের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে অতি সাম্প্রতিক, তেমনি নৃবিজ্ঞানের গবেষনাও অপরিপক্ক। সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও গবেষনার মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, মানব সমাজের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের নানা বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান ইত্যাদির মধ্য দিয়েই নৃবিজ্ঞানের গবেষনা পরিচালিত হয়। তবে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান জ্ঞানের শাখা হিসেবে গত শতাব্দির শেষার্ধে এর প্রকাশ।

নৃবিজ্ঞানের গবেষনা তার পদ্ধতিগত কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কারনে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য যে কোন শাখার তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। ফলে নৃবিজ্ঞানের গবেষনার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সমাজ, সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যকার অন্তর্নিহিত চিত্রকে সঠিক ভাবে তুলে ধরা যায়।

বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপের সমাজে যে কোন উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন, এমনকি সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা ও সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পরিচালনায় ও প্রায়োগিক নৃবিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করা হচ্ছে। অগ্রসর কিংবা অনগ্রসর সংকটাপন্ন কিংবা সংকট মুক্ত যে কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাক-নিরীক্ষন, পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষনা লব্ধ তথ্য কাজে লাগানোর প্রয়াস চলছে। এর অন্যতম কারন হচ্ছে একমাত্র নৃবিজ্ঞানীগনই সফলভাবে শ্রমনির্ভর, কষ্টসাধ্য উপায়ে উদ্দিষ্ট জন গোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়ে তাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে (দীর্ঘ মেয়াদী প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন ও পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়ায়) তথ্য সংগ্রহ করেন, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে অবগত হন যেমনটি-সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য শাখায় সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মত একটি

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও গতানুগতিক সমাজের উন্নয়নে নৃবিজ্ঞানকে দীর্ঘদিন প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। কারন এটি তত্ত্বীয় জ্ঞান দানের পাশাপাশি ক্ষেত্র গবেষনার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দৈহিক নানা দিক সম্পর্কে বাস্তবিক ও জীবন্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানের গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উন্নয়ন ও কল্যান মূলক প্রতিশ্রুতি জাগ্রত করতে হবে। (চৌধুরি ও রশীদ, ১৯৯৫, ১৬২)

এসকল গুরুত্বপূর্ন দিক বিবেচনায় রেখেই বর্তমান গবেষনার জন্য বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যগত ও প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক বোম নৃগোষ্ঠীকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত বোম নৃগোষ্ঠীর উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষনাকর্ম পরিচালিত হয়নি। কাজেই বর্তমান গবেষনা তাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি এথনোগ্রাফি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।
নৃবিজ্ঞানের এ ধরনের গবেষনার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কারন বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জনগন ও এদেশের নাগরিক। কিন্তু বিভিন্ন কারনে তারা অনেক সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এছাড়া তাদের বসবাসের স্থান হিসাবে ও দেখা যায় দেশের সীমান্তবর্তী এলাকাই প্রধান। সুতরাং তাদের জন্য কি ধরনের সরকারী নীতিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নেয়া প্রয়োজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের সমাজের প্রকৃত চিত্র দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলোর জানা খুবই জরুরী। বর্তমান গবেষনা কর্মটি এ বিষয়ে কার্যকরী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া দেশে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা গুলো যারা জনগনের কল্যানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তারাও এ গবেষনালব্ধ তথ্য জেনে তাদের কর্মসূচী নিয়ে এ ধরনের নৃগোষ্ঠীগুলোর সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারবে। এ সকল গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় বসবাসরত 'বোম নৃগোষ্ঠীর' সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষনা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষনায় বান্দরবান জেলার অর্ন্তগত 'বোম' গ্রাম সমূহকে নির্বাচন করা হয়েছে। দীর্ঘকাল থেকে এই গ্রাম সমূহে বোমরা বসবাস করে আসছে। ফলে আধুনিকতার সাথে ঐতিহ্যবাহী 'বোম' সমাজের অবস্থান ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। 'বোম' জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করা হয়েছে, তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে বোমরা কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা। এই অধ্যয়নটিতে আটমাস মাঠপর্যায়ে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সঠিক চিত্রটি তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক নৃগোষ্ঠী বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে যাদের সম্পর্কে এখনও বস্তুনিষ্টভাবে বেশী কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার নৃগোষ্ঠীগুলোর সমস্যাসমূহ অনুধাবন এবং এগুলোর সমাধানের বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলো চেষ্টা করছে তাদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে। বর্তমানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীদের সমস্যা নিরুপণ, সমাধান এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন যা সময়োপযোগী এবং কার্যপোযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়াও বর্তমান পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিশেষত তাদের অস্তিত্ব আজ বিলীন হওয়ার পথে। মূলত নৃবিজ্ঞানীদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই নৃগোষ্ঠীগুলোর জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান গবেষণাটি কতিপয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। প্রথমতঃ 'বোম' আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের এই 'বোম' নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে বিলীন হওয়ার পথে সে সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং এমনকি 'বোম' জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে। সর্বোপরি, এই গবেষণাটি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন চিন্তাবিদদের মাঝে কিছু তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান গবেষণাটি এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি বাংলাদেশের 'বোম' নৃগোষ্ঠীর অনুসন্ধানমূলক একটি জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা। এটা সন্দেহাতিতভাবে বলা যায় যে, এটি পাঠক ও নবাগত গবেষকদের মাঝে গবেষণার একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রমের বিভিন্ন সময়ে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানসমূহ সংগ্রহ এবং যাচাইয়ের পর যে তথ্য সমূহ সংযুক্ত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি যথার্থ উৎকর্ষতার দাবী রাখে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন অচেনা জায়গায় একটি গবেষণা করতে গেলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। একজন গবেষক কখনই এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারেন না। এইসব অসুবিধা মোকাবেলা

Dhaka University Institutional Repository

করেই তাঁকে গবেষণা পরিচালনা করতে হয়। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপী পরিচালিত হয়, এটা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই গবেষণাটি যদিও নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে তারপরও আমি মনে করি মাঠপর্যায়ের কাজে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও সময় নিতে পারলে ভাল হতো। আমি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই 'বোম' নৃগোষ্ঠীর কোন লিখিত ইতিহাস নেই। গ্রামবাসীরা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় এই নব্য শিক্ষিত বোম গ্রামবাসীরা তাদের অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য দিতে পারেনি। তাদের অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক সময়ই সেটা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। মাঠ পর্যায়ের কাজের সময় রোদের প্রখরতা, তাপদাহ এবং প্রচন্ড শীত প্রায়ই আমাকে অসুবিধার সম্মুখীন করেছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন 'বোম' পাড়াগুলোতে যেতে হতো তখন প্রায় সকল রাস্তাই এতটা পিচ্ছিল ছিল যে, হাঁটা অসম্ভব হয়ে যেতো। 'বোম' বাড়ীগুলো অধিকাংশই পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বলে পাহাড় বেয়ে উঠতে হতো এবং বৃষ্টির দিনে এতটাই পিচ্ছিল ছিল যে, কয়েকবার ছোট খাট দূর্ঘটনায়ও পতিত হতে হয়েছে। এছাড়াও পাহাড়ী বাড়ীগুলোর ভেতর দিয়ে চলাফেরার সময় বিষাক্ত পোকার কামড় ও সহ্য করতে হয়েছে। এখানে পানীয় জলের অভাবও প্রকট। যদিও বান্দরবান একটি জেলা শহর, তথাপি এখানে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার যথেষ্ট অভাব। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার সময় কালে আমাকে বান্দরবান শহরের পার্শ্ববর্তী বোম গ্রামে বিভিন্ন সময়ে তথা দীর্ঘ আটমাস অবস্থান করতে হয়েছে। এর মধ্যে বর্ষার তিন মাস বেশী কষ্টকর। আর শীতকালে পাহাড়ী রাস্তায় চলাফেরা নিরাপদ। তথাপি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকল কষ্টকে ছাপিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। একজন গবেষক হিসাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সব ধরনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে। সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রায়ই অধ্যয়নকৃত স্থানে পূনরায় মাঠ সম্পাদনা (Field Editing) সম্পন্ন করতাম। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে গ্রামবাসীদের সাথে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগীতামূলক সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ এবং আপ্যায়িত করেছে। তারা আমাকে পরিবারের একজন বন্ধু হিসাবে তাদের আনন্দ বেদনার অনুভূতিগুলো আমার সাথে অংশগ্রহণ, আলোচনা ও বিনিময় করেছে যার মানবিক আবেদন আমার কাছে অপরিসীম। মাঠ পর্যায়ের এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে আনন্দের স্মৃতি। সর্বোপরি, বহুবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুরো গবেষণাটি যথাসাধ্য নিষ্ঠা এবং আন্ত

Dhaka University Institutional Repository

রিকতার সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পরও উল্লেখ্য যে কোন কিছুই সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। জ্ঞানের পরিমার্জন ও সংশোধনেই একে সমৃদ্ধ করে।

সাহিত্যবিষয়ক পর্যালোচনা

মানবজাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হচেছ জ্ঞানবিকাশের ক্ষেত্রটি। মানবজাতির যাবতীয় তত্ত্ব, মতবাদ, ইতিহাস, দর্শন, পদ্ধতি, কৌশল, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব কিছুই ধারণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে সাহিত্য আকারে। তাই অর্জিত জ্ঞানের আঁধার এবং উৎস হলো পুস্তক। যে কোন গবেষণাকার্য শুরুর প্রথমেই গবেষকের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হিসাবে সম্পর্কিত সাহিত্যকেই বিবেচনা করা হয়। কারন কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পরীক্ষা বা যাচাই হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহের জন্য পেশাগত সাহিত্য অনুসন্ধান করা যায়। এছাড়াও সাহিত্য সমীক্ষা, গবেষনা প্রতিবেদন এবং কারনগত পর্যবেক্ষনের প্রতিবেদন ও কোন ব্যক্তির পরিকল্পিত গবেষণা অনুকল্প সংশ্লিষ্ট মতামতের অবস্থান নির্ণয়, পাঠ এবং মূল্যায়নকে নির্দেশ করে। পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য বলতে সাধারণত প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নাল, সাময়িকী, পত্রিকা, গবেষনা প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত সরকারী ও বেসরকারী নথিপত্র, সমসাময়িক পরিসংখ্যান, বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদিকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গবেষকগণ কর্তৃক পার্বত্য চট্রগ্রামের বসবাসকারী নৃগোষ্ঠী সমূহের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বোম নৃগোষ্ঠীর উপর এককভাবে কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সরকারী সমীক্ষা গুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বোমদের উপর যে সকল গবেষনা হয়েছে তা বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। অতীতে বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে তেমন গবেষণা পত্র পাওয়া যায়নি। তবে ব্রিটিশ শাসকদের ১৯ শতকের মাঝামাঝি থেকে ২০ শতকের প্রথম পর্যন্ত বেশ কিছু জাতিতাত্ত্বিক বই রয়েছে যা এদেশের আদিবাসীদের নৃগোষ্ঠীদের সংক্ষিপ্ত রূপে উপস্থাপন করে। এর মধ্যে বোম নৃগোষ্ঠী সম্পর্কেও উল্লেখ আছে। ডালটন (১৮৭২), হাস্টিংটন (১৯০৬), ম্যাকেঞ্জি (১৯৮১), পিয়েরে বেসেইনে (১৯৫৮) প্রমুখ। এই বইগুলো তৎকালীন প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছিল। শুমারী রিপোর্ট, জেলা গেজেটিয়ার যা ব্রিটিশ সময় থেকে এ পর্যন্ত সম্পাদিত হয়েছে তা এক্ষেত্রে তথ্যের উৎসের জন্য সহায়ক হয়েছে। নিম্নে বম নৃগোষ্ঠী সংক্রান্ত কয়েকটি বই, প্রবন্ধ এবং পত্রিকা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলঃ-

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসী জনগোষ্ঠী (২০০৭)

ইসলাম জাহিদুল, কামাল মেসবাহ, চাকমা সুগত কর্তৃক সম্পাদিত (বাংলাদেশএশিয়াটিকসোসাইটি, ২০০৭, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫)-অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কয়েকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর লোক যাদের জীবন প্রবাহ, কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ইত্যাদি প্রায় একই রকম, তারা নিজেদের 'বম' নামে আখ্যায়িত করতো বলে এ বইটিতে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও তাদের আদিনিবাস চিন পর্বত এলাকার দক্ষিণে তসন ও উত্তরে জৌ উপত্যকা ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল এবং এরা খুমী জনগোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে বসবাস শুরু করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। বমদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অর্ন্তগত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ্য রয়েছে যে বম সমাজে ছেলে মেয়েদের বিয়ে করানো এবং বিয়ে দেয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব-এবং এজন্য তারা দু'জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে। বম সমাজে বিয়ের পণ সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। তাদের অর্থনীতি জুমচাষ ভিত্তিক হলেও বর্তমানে তারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহন করছে বলে ও উল্লেখ রয়েছে। বমরা নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ নিজেরাই তৈরী করে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিচ্ছদ রয়েছে। তারা বিভিন্ন রকম অলংকার পরিধান করে বলেও উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে নিজেদের সৃজনশীলতার পরিচয় সম্পর্কে ও উল্লেখ রয়েছে। তারা বন হতে প্রাপ্ত গাছ, বাঁশ, ছন, পাতা, তুলা, ঝুমুরপাতা এবং পশুরচামড়া, পাখি পালক, ও লেজ ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী ও বাদ্য যন্ত্র তৈরী করে এছাড়াও তারা দু'চালা বিশিষ্ট মাচাংঘর তৈরী করে বসবাস করে। তারা পাহাড়ের গাছ, বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতির উপকরণ দিয়ে মাচাংঘর তৈরী করে। ঘরের আকৃতি পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে। খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে বমরা ভাতের সাথে মাছ ও মাংস খেতে পছন্দ করে। তারা শাকসব্জি তেমন বেশী খায় না। বমদের সাংস্কৃতিক জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের নিজস্ব নৃত্যগীত রয়েছে যা তারা বিভিন্ন ধর্মীয় ও বাৎসরিক উৎসবে পরিবেশন করে থাকে। বর্তমানে বমদের অধিকাংশই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, বড়দিন হচ্ছে তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ ছাড়াও তারা বর্ষবিদায়, বর্ষবরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। বম সমাজে নবান্ন উৎসবকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ উৎসব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আদিকাল হতে বমদের পূর্ব পুরুষেরা এ ধরনের উৎসব উদযাপন করে আসছে বলেও উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উপজাতি (১৯৮৫)

চাকমা, সুগত, এই বইটিতে পার্বত্যচট্টগ্রামের বম নৃগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই বইটিতে তাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা এবং হাতিয়ার সম্পর্কে ও ধারণা দেয়া হয়েছে। এই বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে বমরা এককালে জড়ো উপাসক থাকলেও বর্তমানে তারা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে যার ফলে তাদের সমাজ-জীবন, পোশাক পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। অতীতে আরাকান রাজ্যে বসবাস কালে তারা 'লাংগি' বা লাংখে নামে পরিচিত ছিল। এই বইটিতে তিনি আরও লিখেছেন যে অতীতে তারা নিজেদের 'লাই' বা লাইমি' বলে পরিচয় দিত। এই শব্দগুলোর অর্থ হলো মানুষ। এই বইটিতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, বমদের পাংহয় দলের মিলাই বংশীয় লোকেরা অনেক আগে থেকেই লোহা ও পিতলের ব্যবহার জানতো। তারা এসব ধাতু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী কর তো এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহার করতো। অতীতে তারা অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এতবেশী অনুভব করতো যে তারা মৃতকে কবর দেয়ার সময় তার সাথে কবরেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর লোকেরা 'মিথিখোয়া' বা মৃতের দেশে চলে যায় এবং সেখানে নতুনভাবে জীবন শুরু করে বলে । এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বমদেও আধুনিক শিক্ষা, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহনের ফলে এসব বিশ্বাস আজ আর নেই। বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষায়ও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে।

বাংলাদেশে আদিবাসী (২০০৪)

রউফ জাহান আরা এই বইটিতে বম নামের উৎপত্তি, তাদের ভাষা, বিবাহ, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, ধর্ম এবং বিভিন্ন প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বম নৃগোষ্ঠীর আগমন ও বসতি স্থাপনের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, জড়োউপাসনাভিত্তিক ধর্মীয় ব্যবস্থা, যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব, নিজস্ব লিখিত ভাষা ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কে এই বইটিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে যে বম ও পাংখোয়া জাতির অন্তর্ভূক্ত দুই ভাই থেকে বম ও পাংখোয়া এদুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং এরা আদি মঙ্গোলীয় নর গোষ্ঠীর অর্ন্তগত। সুনতলা ও পাংহয় এদুটি বম সম্প্রদায়ের প্রধান গোত্র, এদের আরও অনেক উপগোত্র রয়েছে। অতীতে এরা জড়োউপাসক ছিল এবং এদের সৃষ্টিকর্তার নাম ছিল পাথিয়ান এবং অস্তমিত সূর্য ভগবান পাথিয়ানের ঘরে ঠাঁই নেয় বলে, এদের দৃঢ় বিশ্বাস। খোজিং বম সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। এই বইটি অনুসারে বম নৃগোষ্ঠী ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝা-বৈদ্যি

Dhaka University Institutional Repository

এবং জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাসী। এ বইটিতে আরও বর্ণনা করেছেন যে এককালে অরণ্যচারী বম নৃগোষ্ঠী শিকার করা বন্য পশুর চামড়া দিয়ে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরী করতো। তাদের বিবাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং গোত্র বর্হিভূত বিবাহ ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। এছাড়াও বম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন নৃত্যগীত, বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনাও এই বইটিতে রয়েছে। আরও রয়েছে বর্তমানে বহু বম খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাদের পারিবারিক, সামাজিক রীতিনীতিতে ও ঘটেছে পরিবর্তন।

বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী (২০০১)

দ্রং সঞ্জীব এই বইটিতে বম আদিবাসী সমাজের প্রচলিত মিথ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, হাতিয়ার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন তারা বিশ্বাস করে ছোট পাখির কিচির মিচির শুনতে পাওয়া খুবই ভাগ্যের। তাদের আবাস ভূমি পাহাড়ে কারণ পাহাড়ে মেঘ জমতো এবং মেঘকে পুজা দিত তারা । কারণ মেঘ হতে বৃষ্টি না হলে জুমে ফসল হবে না। তারা বিশ্বাস করতো পাহাড়ে নদীতে ঝরনার পাথর নাকি চলাচল করতো মানুষের মত। একদিন দেবতার আহ্বানে পাথর স্থির হয়ে যায় এবং সেখানে মনুষ্যবসতি গড়ে উঠে বলে তারা বিশ্বাস করে। পাথর ও বৃক্ষকে তারা পুজা করতো। এছাড়াও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েও তাদের নিজস্ব বিশ্বাস রয়েছে যা যুগে যুগে তাদের মধ্যে গেঁথে রয়েছে যার বিশদ বর্ণণা এই বইটিতে রয়েছে।

বাংলাদেশের আদিবাসী প্রবাদ-প্রবচন (২০০১)

বড়ুয়া বাবুল চৌধুরী এ বইটিতে পার্বত্যচট্টগ্রামের বমআদিবাসীর বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেমন "রিল-এ নাকি পরলোকের পথ রোধ করে", "ভূতের লাঠি নাকি জুমের ভূতকে বাধা দিতে পারে", "কাক ভীতু বলে নয় বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে" ইত্যাদি।

Ancient Society (1877)

মর্গান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Ancient Society গ্রন্থে বর্ননা করেন যে কিভাবে অবাধ যৌনাচার ভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক কালের একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয় ঘটায়। তিনি সমাজের ক্রমবিবর্তনের তিনটি প্রধান পর্যায়ের নাম উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে বন্যদশা, বর্বর দশা এবং সভ্য দশা। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বন্যদশার নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে যৌথ বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক কন্যস্যানগুইন পরিবার এবং বন্যদশার উচ্চ ও বর্বর দশার নিম্ন পর্যায়ে দলীয় বিবাহ ভিত্তিক পুনালুয়ান পরিবার ব্যবস্থা ছিল এবং তখনকার সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। যৌথ ও দলীয় বিবাহের ফলে সন্তান ও বংশধারা নির্নয়ের জন্য পিতাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হতো না। এ সময় পুরুষরা শিকার করতো কিন্তু পশু শিকার জীবিকা নির্বাহের কোন নিশ্চিত বা নির্ভর যোগ্য উপায় ছিলনা। সন্তান লালন পালন, গৃহরক্ষা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ছিল নারীর উপর অর্পিত। পশুপালন জীবিকার উপায়ে পরিগণিত হওয়ার পর পরিবারে নারীর চেয়ে পুরুষের প্রতিষ্ঠা অধিক গুরুত্বপূর্ন হতে থাকলো এবং অন্যদিকে দৃঢ় সামাজিক অবস্থার ফলে পুরুষ নিজ সন্তান সন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা রূপান্তরিত হয়ে পিতার আধিপত্য বিস্তার লাভ করলো। এভাবে সিনজাসসিয়ান পরিবারের বিবর্তনে একক অনুপরিবারের ও পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব হলো। মর্গান সামাজিক ক্রম বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্কের বিবর্তনেরও বর্ননা দিয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে শ্রেনী মূলক ও বর্ননা মূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের উল্লেখ করেন। শ্রেনী মূলক জ্ঞাতিসম্পর্ক অনুসারে একই পর্যায়ের সকল ব্যক্তি একই নামে সম্বোধিত হবে। যেমন-পিতা, পিতার ভাই, পিতার পিতা, সকলেই পিতা নামে সম্বোধিত হবে। অন্যদিকে বর্ননা মূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি সম্পর্ককে সুনির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করা হয়। যেমন-পিতার ভাইকে চাচা, পিতার পিতাকে দাদা ইত্যাদি। বিবাহ ও পরিবারের এই ক্রম বিবর্তন বাঙালী জনগোষ্ঠীকে এক স্বামী-একস্ত্রী স্থায়ী যুগল ও একক পরিবারের পর্যায়ে উপনীত করেছে। এ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ধারা তাদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয়। বম নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও পিতৃতান্ত্রিক এবং উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ও পিতৃসূত্রীয়।

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১৯৭২)

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তার এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সমগ্র পৃথিবীর সংখ্যা লঘিষ্ঠ মানুষেরা কোন না কোন ভাবে বিপন্ন। প্রযুক্তি ও আধুনিকায়নের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, ততই আদিম আদিবাসী মানুষেরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ও ভাষা, আচার-আচরন ও অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থা হারাচ্ছে। এঙ্গেলস তাঁর পরিবার, ব্যক্তিগত ও মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-"নিজস্ব ভূখন্ড ও নিজস্ব নামের অস্তিত্ব। প্রত্যক্ষ বসবাসের এলাকা ছাড়াও প্রত্যেকটি উপজাতির দখলে মাছ ধরা পাত্ত শিকারের জন্য বেশ বিস্তীর্ন অঞ্চল থাকত। এরপরে এবং প্রতিবেশী উপজাতির দখলী অঞ্চল অবধি বেশ বিস্তৃত নিরপেক্ষ ভূ-খন্ড থাকত; দুটি পাশাপাশি উপজাতির

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা সমগোত্রীয় হলে এই নিরপেক্ষ ভূ-খন্ড অপেক্ষাকৃত ছোট হত এবং না হলে তা বিস্তৃত হত। এইভাবে অসুনির্দিষ্ট সীমানার ভিতরকার ভূ-খন্ডটি ছিল উপজাতির সাধারনের ভূমি যা প্রতিবেশী উপজাতিরা মানতো এবং উপজাতিটি বাইরের আক্রমন হতে এ ভূমিটি রক্ষা করতো। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সীমানার অনিশ্চয়তা নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো তখনই যখন জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে।" এঙ্গেলসের এই সংজ্ঞাটি বম নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কারন বর্তমানে বম নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপে নানান আর্থ-সামাজিক পীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতার সম্মুক্ষীন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম চাষ ঃ (২০০৩)

প্রশান্ত ত্রিপুরা ও অবন্তী হারুন, এই বইটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীদের ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। জুম চাষ একটি সনাতনী চাষ পদ্ধতি। বলা হয়ে থাকে ১৮৬০ সাল হলে এ অঞ্চলের একশ ভাগ পাহাড়ীদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান ভিত্তি ছিল জুম চাষ। এর সাথে এতদঅঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে কৃষির যে বৈশিষ্ট্য গুলো বেশীরভাগ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত তা হচ্ছে "কর্ষন ও সেচ ব্যবস্থা"। কিন্তু এদুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অন্য একটি ব্যবস্থা রয়েছে যা পৃথিবীর গ্রীস্ম মন্ডলীয় অঞ্চলে লক্ষ্যনীয়, যেটিকে Shifting Cultivation বা স্থানান্তরিত কৃষি বলে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জঙ্গলাকীর্ন জমি কেটে সাফ করে তাতে আগুন লাগিয়ে পরবর্তীতে আবাদ করা এবং এক বার ব্যবহৃত জমি প্রাকৃতিক উপায়ে আবার জঙ্গলাকীর্ন হয়ে না উঠা পর্যন্ত সেখানে একই পদ্ধতিতে পুনরায় চাষ না করা। এই উপাদান প্রক্রিয়ার আঞ্চলিক নাম হচ্ছে-'জুম চাষ'। বম ভাষায় একে বলা হয় 'Lao'। বম নৃগোষ্ঠীরা ঐতিহ্যগত ভাবে এই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। একে ঘিরে তাদের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উৎসব। কিন্তু বর্তমানে জুম ভূমি, জনসংখ্যা অনুপাতের পরিবর্তনের ফলে জুম চক্র ছোট হয়ে আসছে, ফলে তাদের খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা হতে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি ঃ (১৯৯৩)

জাফার আহ্মাদ হানাফী এ বইটিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠী রয়েছে যারা অরন্য জনপদে কিংনা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করে। এরা সভ্যতার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশই তাদের আদিম সংস্কৃতিকে আঁকড়ে রাখতে চায়। এমনই একটি নৃগোষ্ঠী হচ্ছে 'বম'। বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকা এ নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এদের অধিকাংশই প্রকৃতি উপাসক। তাদের নিজস্ব প্রাচীন ইতিহাস, লোক কাহিনী, কিংবদন্তী, পুঁথি সাহিত্য এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বন রয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন আচার, আচরন করে থাকে। এছাড়াও তাদের রয়েছে। বৈচিত্র্যপূর্ন নাচ, গান এবং বিভিন্ন রকমের বাদ্য বাজনা।

Descriptive Ethnology of Bengal (1978)-

ই.টি.ডালটন রচিত এ গ্রন্থটিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তরাংশের বেশ কিছু পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর জীবনের তুলনামূলক বর্ণনা করা হয়েছে। বইটি বম নৃগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ রয়েছে যে ১৯ শতকের কোন এক সময় হতে এরা আরাকান হতে বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরন্যে বসবাস করতে থাকে। তাদের হাতে সব সময় শিকারী যন্ত্র দেখা যেত, অর্থাৎ ঐ সময় তারা শিকারী জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল।

The Nature and Culture of Chittagong Hill Tracts t (1994)

ত্রিপুরা সুনেন্দু লাল এই বইটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩ টি নৃগোষ্ঠীর উপর রচিত। এই বইটিতে এই নৃগোষ্ঠী সমূহের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, তাঁদের প্রচলিত প্রথা ও বিশ্বাস সমূহের উল্লেখ রয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে যে বম নৃগোষ্ঠীর মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং এরা অতীতে প্রকৃতি উপাসক ছিল। অতীতে এরা শিকারী জাতি হিসাবে পরিচিত।

Ethnography, Step by Step (1989)

M. Fetterman David এর জাতিতাত্ত্বিক গবেষনাপদ্ধতির উপর বইটি রচিত। লেখক বিভিন্ন গবেষনা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ননা করেছেন যা ক্ষেত্র গবেষনার জন্য অত্যন্ত জরুরী। এথনোগ্রাফি হচ্ছে মানব সমাজকে বিশ্লেষন করার কৌশল। এখানে লিখনীর মাধ্যমে জনগনের বর্ননা দেয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজের জনগন তাদের সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় আচার আচরনের মাধ্যমে। সমাজে যা কিছু দেখা যায় কিংবা যা কিছু শোনা যায় তার বিবরনই হচ্ছে এথনোগ্রাফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এথনোগ্রাফিতে যে পদ্ধতিটি তথ্য সংগ্রহের জন্য অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা। অর্থাৎ গবেষক নিজেই পর্যালোচিত কর্মকান্ড সমূহের প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় সদস্য হিসেবে অংশ গ্রহন করবে। প্রকৃত এথনোগ্রাফি মূলত সামগ্রিক গবেষনা। সাংস্কৃতিক যে বিষয়ে গবেষনা চালানো হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া ভৌগলিক মানচিত্র, স্থানীয় আদিবাসীদের আবাসন,

Dhaka University Institutional Repository

বৈষয়িক সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, জীবিকার মাধ্যম, আত্মীয়তার সম্পর্ক, বয়সভেদে শ্রেনীবিভাগ, স্থানীয় ভাষা, ধর্মীয় আচার আচরন মূল্যবোধ ইত্যাদি সকল বিষয়ই এথনোগ্রাফিক গবেষনার আওতাভুক্ত থাকে। নৃতাত্ত্বিক গবেষনায় এথনোগ্রাফিক তথ্য সংগ্রহে কতগুলো পর্যায়ক্রমিক কৌশল ব্যবহার করা হয় যা হচ্ছে, দীর্ঘ মেয়াদী অবলোকন, সরেজমিনে পর্যবেক্ষন, অংশ গ্রহন এবং নিজেকে সংশ্লিষ্ট করন ও মৌখিক ও অমৌখিক উভয় ধরনের আচরন অনুসন্ধান। বর্তমান জটিল সমাজ জীবনের বিভিন্ন দল-উপদল, সংস্কৃত-উপসংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটি সকল পদ্ধতি হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রাথমিক বম ভাষা শিক্ষা ঃ- (২০০৩)

এস. লনচেও এর এই বইটি উপজাতীয় ভাষা শিক্ষা কোর্স কর্মসূচির আওতাধীন বম ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষর জ্ঞান) এর উপর ভিত্তি করে রচিত। এই বইটিতে বম ভাষার বর্ণমালার উল্লেখ রয়েছে। বম ভাষায় সর্বমোট ২৫টি বর্ণ রয়েছে। এগুলো দু'প্রকার, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। বম ভাষায় স্বরবর্ণ ৬টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ১৯টি। এছাড়াও রয়েছে বম ভাষায় বাক্য গঠন যতিচিহ্ন সমূহ এবং এগুলোর ব্যবহার, আবেদন পত্র লেখার প্রক্রিয়া। বম ভাষায় সপ্তাহের সাত বারের নাম, ইংরেজী বার মাসের নামের উল্লেখও রয়েছে।

পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি ঃ- (২০০২)

এস. এ. প্রু এর এই বইটি পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত। ভাষা সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের একটি মাধ্যম। ভাষা সাধারন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, কর্ম ও প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। মানব জীবনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের দু'একটি অগ্রগামী উপজাতীয় নৃগোষ্ঠী ব্যাতিত অন্যান্যদের ভাষার কোন নিজস্ব বর্ণ নেই। ভাষা মুখে মুখেই বংশ পরম্পরায় থেকে গেছে, লিখিত রূপ দিতে পারেনি। তাই এদের ভাব বিনিময় ও চিন্তাধারা প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। যদি লিখিত রূপ থাকতো তাহলে তারা সমাজের পারস্পরিক চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করে নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে তা নিজ নিজ জনগোষ্ঠী সহ অপরাপর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে পারতো। তাই উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীর শিক্ষায় তাদের মাতৃভাষার প্রচলন না হলে অদূর ভবিষ্যতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে। তাই এর অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রত্যেকটি সমাজই একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় সংস্কৃতির অধিকারী যা সামাজিক গতিশীলতা ও ক্রিয়াশীলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই তাত্ত্বিক কাঠামোতে একটি সমাজকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে ঐ সমাজের নিজস্ব ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রাকৃতিক পরিবেশগত ব্যবস্থা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং অন্য সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক সংযোগ ও আদান প্রদান-এ সব কিছুই বিশ্লেষন করতে হবে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যেক ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ন এবং ঐ ভাষাভাষীদের প্রাকৃতিক ও সামজিক অর্থাৎ সামগ্রীক পরিবেশকে প্রকাশ করার যোগ্যতা রাখে। প্রত্যেক ভাষাই তার সামাজের পরিবর্তিত বাস্তবতায় নিত্য নতুন শব্দ আবিস্কার ও একীকরনের যোগ্যতা রাখে। তাই নৃবিজ্ঞানীরা লিখিত ভাষার পাশাপাশি অলিখিত কথ্য ভাষাকে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন। তাই পার্বত্য জনগোষ্ঠীর স্বকীয় ভাষা রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করা উচিত।

The Chittagong Hill Tracts and People t (1996)

Lewin এর এই বইটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠী সমূহের একটি বিবিধ বর্ননা সম্বলিত। এখানে তাদের শ্রেনী ব্যবস্থা, সামাজিক বিধিনিষেধ, প্রথা, নেতৃত্বের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই বইটিতে সুনির্দিষ্ট একটি নৃগোষ্ঠীকে বর্ণনা করা হয়নি।

অস্পষ্টগ্রাম ঃ (১৯৭৯)

পিটার. জে. বার্টোসি ষাটের দশকের শেষ ভাগে কুমিল্লা জেলার দুটি গ্রামের (হাজীপুর ও তিনপাড়া) উপর গভীর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে এ গবেষনাটি সম্পন্ন করেন। এখানে তিনি 'গ্রাম' এর সংজ্ঞা নিরুপনের পাশাপাশি সমাজ কাঠামো ও সম্প্রদায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেখান যে ভূমি মালিকানা এবং আয়ের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে গ্রামে বিভিন্ন শ্রেনী রয়েছে। এছাড়াও মৌসুমি জলবায়ুর সাথে অর্থনীতির উত্থান পতনের সম্পর্ক নির্নয় করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, অনেক ক্ষমতাধর ধনীকৃষক মৌসুমি জলবায়ুর উত্থান পতনের এবং বিদ্যমান বহুমুখী উত্তরাধিকার ব্যবস্থার কারনে পূর্বের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনা। ফলে নিয়মিত এ উত্থান পতনের জন্য কোন পরিবারের সম্পত্তি ঘাটতি হয় আবার কোন পরিবারের ক্ষেত্রে সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়।

বাংলাদেশের একটি গারোগ্রাম ঃ (১৯৮৬)

ডঃ জাহিদুল ইসলাম ১৯৮৪-৮৬ সালে শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ী উপজেলার একটি গ্রামে (আন্দারোপাড়া) তাঁর গবেষনা কর্মটি পরিচালনা করেন। তিনি মূলতঃ গারো সমাজের সামাজিক,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে গারো সামজের মাঝে আধুনিক শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের কারনে সামাজিক কাঠামো, পরিবার ব্যবস্থা, গোষ্ঠী ব্যবস্থা, ধর্মীয় সংগঠন, স্থানীয় নেতৃত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ নানা উপাদানের ফলে পরিবর্তনের প্রবনতা ও প্রকৃতির বিশ্লেষন করেছেন।

নৃবিজ্ঞানঃ উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি (১৯৯৫)

চৌধুরী এবং রশীদ রচিত এই বইটিতে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সংস্কৃতির গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীগন যে পাঁচটি মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গি বা নীতিমালার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তার বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গুলো হচ্ছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষেত্রগবেষনা সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা, তাত্ত্বিক ধারনা গঠন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ। গবেষণা পরিকল্পনা প্রনয়নের পূর্ব থেকে শুরু করে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা পর্যন্ত এ সকল নীতিমালা মেনে চলতে হয়ে। এই বইটিতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গবেষণার ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি যার দ্বারা গবেষনার সাথে সম্পৃক্ত মানব আচরণ, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা না করে সমগ্রকের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপরই বেশী নির্ভর করা হয়। কারণ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে থেকে তাদের জীবন ধারন পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আচরণ সম্পর্কে জানার জন্য গবেষককে কোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণে না গিয়ে ঐ সংস্কৃতির আভ্যন্তরীন নানা সাংস্কৃতিক উপাদানের বৈশিষ্ট্যাবলী সামাজিক বাস্তবতার নিরিখেই বিশ্লেষণ করা উচিত যা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন নির্দিষ্ট সমাজে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা করতে গিয়ে তাকে উক্ত বিষয়ের সামঞ্জস্যতার সাথে অসামঞ্জস্যতারও বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হয়। মূলত সফল নৃবৈজ্ঞানিক গবেষনার জন্য উপরোক্ত নীতিমালা গুলোর সঠিক প্রয়োগ বিশেষ ভাবে সহায়ক ।

BawkaRili- (2003)

Loncheu.S.vol-2 এই পত্রিকাটিতে বম সমাজের সাধারন পরিচিতি মূলক বিভিন্নদিক পর্যালোচনা করেছে। তাদের অতীত ইতিহাস, ভাষা, নৃত্য ইত্যাদি। এ ছাড়াও বম সমাজের সাধারণ পরিচিতি মূলক

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রিকাটি অনুসারে বমরা বান যাউস, বানজোগী, বানজোস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিতি ছিল । এই পত্রিকাটিতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে অতীতে 'বম'রা সাহসী যোদ্ধাছিল এবং তারা বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে পরাজিত বাহিনীকে দাস হিসাবে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো। পরবর্তীতে পরাজিতরা তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একসাথে সংগঠিত 'বম'। এর অর্থ হচ্ছে সংযুক্ত বা বন্ধন। তাদের সামাজিক জীবন অত্যন্ত সাধারণ,অর্থনীতি জুম চাষ ভিত্তিক, সাংস্কৃতিক জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতে তারা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। আরও উল্লেখ রয়েছে যে ১৯১৮ সাল হতে বমরা সীমিতভাবে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ ও তার অনুশীলন শুরু করে। তবে এখনো তারা তাদের ঐতিহ্যগত ধর্মের অনেক আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

Social change among the Bawms of the Chittagong Hill tracts- (2006)

Tripura, Sunendo এর এই গবেষণা কর্মটি বম অধ্যুষিত ফারুক পাড়া গ্রামে পরিচালিত হয়েছে। বম নৃগোষ্ঠীর পরিচিতি, অতীত ইতিহাস, সামাজিক জীবনযাত্রা, জুম চাষ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার সম্পৃক্ততা, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোক পাত করা হয়েছে। এছাড়াও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবের ফলে তাদের জীবন প্রণালীতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাও এখানে উল্লেখিত রয়েছে। ধর্মীয় উৎসব হতে শুরু করে জীবনের সন্ধিঃক্ষন সংক্রান্ত বিভিন্ন আচারকে ও বর্ণনা করা হয়েছে।

An Introduction to the Bawm Society- (2002)

Shanu, Zirkung এর এই বইটি বম সমাজের উপর রচিত। এখানে লেখক বমদের সামাজিক ব্যবস্থা, আচার, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং গোত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বমদের সমাজ ব্যবস্থা গোত্রভিত্তিক। সুনতলা এবং পাংহয় তাদের প্রধান দুই গোত্র, যাদের আরও অনেক উপগোত্র রয়েছে। তারা জুম চাষ ভিত্তিক হলেও বর্তমানে অনেক পেশার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে। বর্তমানে তারা খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী হয়ে ও অতীত ধর্মের নিয়ম কানুনও অত্যন্ত শ্রদ্ধানুসারে মেনে চলে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরন করে জ্ঞান অনুসন্ধানের পদ্ধতিই হচ্ছে গবেষনা। ইহা কোন বিষয়ের নতুন দিক উন্মোচন করে, নতুন জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটায় এবং প্রচলিত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে। গবেষনার সাহায্যে কোন বিষয়ের বস্তুনিষ্ট অধ্যায়ের পাশাপাশি সঠিক তথ্যের বিশ্লেষন এবং অনুমান যাচাই করা হয়। আর গবেষনা পদ্ধতি বলতে গবেষনা কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে বুঝায়। অর্থাৎ গবেষনা পদ্ধতি হচ্ছে গবেষনার পাশ্চাত্যে বিদ্যমান দর্শন বা সাধারন নীতিমালা। গবেষক গবেষনা সম্পন্ন করতে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করেন তাই গবেষনা পদ্ধতি। গবেষনার স্তর ভিত্তিক উত্তরনের উপায়, তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের সাথে জড়িত নিয়েম ও কৌশল, তথ্য বিশ্লেষনের বিভিন্ন উপায় ও কৌশল গবেষনা পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। সেক্ষেত্রে গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য এক বা একাধিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারেন। (Kothari, 117, 1988)

নৃবিজ্ঞানীদের গবেষনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-মানুষকে জানা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি রয়েছে মূলত তা হতেই নৃতাত্ত্বিক গবেষনার উদ্ভব। (চৌধুরী ও রশীদ, ১৯৯৫, ৮০) নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি সামগ্রিক সত্তা, সেখানে সমাজের আধার বা কেন্দ্র হিসাবে ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা, আশা-আকাঙ্খা, অনুভূতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, শিল্পবোধ ইত্যাদি নানা দিকের বহিঃ প্রকাশ ঘটে। আর তাই নৃবিজ্ঞানীগন সংস্কৃতিকে একটি সামগ্রিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করে মানব সমাজের বিভিন্ন উপাদান সমূহকে বিশ্লেষনের প্রয়াস নেন। (চৌধুরী ও রশীদ, ৮০, ১৯৯৫)

অধ্যয়নকৃত গবেষনাকর্মটি 'বোম' নামক একটি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, বিশেষত, তাদের জীবন যাপনের ধরন এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। গভীর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাদের ঐতিহ্যগত ও বর্তমান জীবন ধারন পদ্ধতি, সামাজিক রীতি নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি অধ্যয়নকৃত

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির আচরন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নানা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাস্তবতার সম্পর্ক, আচরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্যার ধরন ও প্রকরনকে বিবেচনা করে সম্পূর্ন নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন মূলক পর্যবেক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষনাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণা নকশা

সাধারনভাবে কোন বিষয় নিয়ে বাস্তবে গবেষণা করার পূর্বে কিভাবে গবেষণা কর্মটি পরিচালিত ও সম্পাদিত হবে তা নিয়ে গবেষকগন একটি পরিকল্পনা প্রনয়ন করে থাকে যাকে গবেষনা নকশা বলে। Black ও champion এর মতে- 'গবেষণা নকশা হচ্ছে এমন এক পরিকল্পনা যাতে তথ্য কিভাবে সংগৃহিত ও বিশ্লেষিত হবে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে প্রক্রিয়াধীন অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করা হয়'। গবেষণা নকশা হচ্ছে গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ওঅমিল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিকল্পনা, কাঠামো ও কৌশল বিশ্লেষণ করা। জনডব্লিউ ব্যানেট (১৯৪৮:৬৮৭) একটি ছকের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমের একটি নকশা উপস্থাপন করেছেন। নকশাটি নিম্নরুপ ঃ

সংস্কৃতি গবেষণার নকশা

ক)	ক্ষেত্র গবেষণার সমস্যা বা বিষয়বস্তু নির্বাচন	
খ)	বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাত্ত্বিক কাঠামো গঠন	
গ)	ক্ষেত্র গবেষণার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম	
	১।	প্রথম ধাপঃ তথ্য সংগ্রহ
	ক)	শুমারী, ম্যাপ প্রনয়ন ও প্রাথমিক ভাবে সংস্কৃতির সবকিছু পর্যবেক্ষন
	খ.	পর্যবেক্ষনকৃত বিষয় বস্তুর তালিকা প্রনয়ন
	গ.	প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক উপাদান ও গুনাবলী সমূহ কে আপাতঃ ভাবে বিন্যস্ত করণ।
	২।	দ্বিতীয় ধাপঃ প্রশ্নকরণ
		এ পর্যায়ে গবেষক বিভিন্ন সাংস্কৃতি উপাদান বা গুনাবলী সমূহের সাথে সমগ্র সংস্কৃতি সম্পর্ককে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেন । এ ধরনের সর্ম্পকে কথা মনে রেখে গবেষক অনুমিত

Dhaka University Institutional Repository

		সিদ্ধান্ত গঠন করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন যেমন- পরিসংখ্যান,জীবন বৃত্তান্ত, মনোসমীক্ষণ, প্রশ্নমালা ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা বা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।
	৩।	তৃতীয় ধাপঃ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ
		এ পর্যায়ে গবেষক সংস্কৃতির নানা প্রকরন সমূহকে বিশ্লেষণ করেন এবং এদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্কের মৌলিক রীতিমালা নির্দেশ করেন। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে কি বিশেষ জ্ঞান লাভ করা গেল তা পূর্বে গঠিত তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা এবং ঐ সংস্কৃতির প্রধান প্রধান রুপক সমূহের উপস্থাপন করার কাজটিও এসময় সমাপ্ত করা হয়।

(চৌধুরী, রশীদ, পৃ ৭৬-৭৭, ১৯৯৫)

মূলত গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও যথাযথ পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থাই গবেষণা নকশা। বর্তমান অধ্যয়নটি একটি এথনোগ্রাফিক গবেষণা। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা নকশাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদুটি ভাগ হচ্ছে-১) সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ২) গুনবাচক তথ্য।

সংখ্যাগত তথ্য সমূহ

এটা তথ্য সংগ্রহের একটি কৌশল যেখানে পরিসংখ্যানগত ভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস, তুলনামূলক বিচার এবং পরিমাপণ করতে সহায়তা করে থাকে। এটা কিছু সংখ্যাগত প্রপঞ্চ সমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। পরিসংখ্যানগত কৌশল দুটি পৃথক সামাজিক প্রপঞ্চের সম্পর্কে দিক নির্ধারণী তথ্য উন্মোচন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এতে আছে অনেক সহজ, প্রয়োজনীয়, তথ্য স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন পরিমাপ সমূহের পরিসংখ্যান কৌশল যেমন- সারণিকরণ, শ্রেণীবদ্ধকরন, জরীপ প্রভৃতি। এই কৌশলগুলো বিশেষভাবে এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

গুণগত তথ্য সমূহ

গুণগত তথ্যের সমাহার বিশেষণ এবং ধারণা পদ্ধতিগতভাবে প্রপঞ্চসমূহ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গুনগত বিশ্লেষণ শুরু হয় মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে যাওয়ার আগে এবং ক্রমাগত চলতে থাকে প্রাপ্ত ধারনাকে পর্যবেক্ষণের পরীক্ষণ, পরিবর্তন সাধন এবং পরিবর্ধন করা পর্যন্ত। সব ধরনের গুনবাচক প্রপঞ্চ

Dhaka University Institutional Repository

এবং তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনের অধীনে। তবে এর কোন সংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয় না। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণ, সামাজিক অবস্থা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার- আচরন, রীতিনীতি, পরিবর্তনের ধরন এগুলো পর্যবেক্ষণ বা গভীরভাবে অনুধাবন করে জাতিতাত্ত্বিক বর্ণণা ও গবেষণাধীন এলাকার মানুষ ও তাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে একটি বিবরণ তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সবসময়ই এক বা একাধিক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে, যা গবেষক তার গবেষণায় প্রয়োগ করে থাকেন। বাস্তব দৃষ্টিতে মনে হয় আসলে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কৌশল নেই। কিছু নৃবৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যা সাধারণত তত্ত্বীয়ভাবে ব্যবহার করা যায় না। এই পদ্ধতিগুলো সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ব্যবহার করা হয়।

স্থান নির্বাচন

বান্দরবান জেলার অন্তর্গত ১৩ টি 'বোম' গ্রাম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে লাইমি গ্রাম, ফারুক গ্রাম, শেরন গ্রাম, গেৎসিমনি গ্রাম, এগেন গ্রাম, বেথেল গ্রাম, মুনলাই গ্রাম, মার্মা গ্রাম, হাতিভাঙ্গা গ্রাম, বগালেক গ্রাম, সাইকট গ্রাম, দার্জিলিং গ্রাম, সুনসং গ্রাম (মাঠকর্ম থেকে সংগৃহীত)। গবেষণার স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে দুটি 'বম' গ্রামকে। এ দুটি গ্রামের নাম হচ্ছে লাইমি গ্রাম ও ফারুকগ্রাম। এই গ্রাম দুটো বান্দরবান সদর থানার অর্ন্তগত। সুদূর অতীত থেকে বোম নৃগোষ্ঠীরা এই গ্রাম দুটোতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছে।

প্রথমতঃ লাইমিগ্রাম- বান্দরবান সদর হতে ৭ কিলোমিটার উত্তরে লাইমি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের জনসংখ্যা ৩৫৮ জন এর মধ্যে পুরুষ ১৮৮ জন এবং মহিলা ১৭০ জন (বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণনাকৃত শুমারী)।

দ্বিতীয়তঃ ফারুকগ্রাম- বান্দরবান সদর হতে ৮ কিলোমিটার উত্তরে ফারুক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের সর্বমোট জনসংখ্যা ৪৭৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২২১ জন এবং মহিলা ২৫৬ জন (বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত শুমারী রিপোর্ট)।

বর্তমান গবেষণার জন্য উভয় গ্রামের খানা প্রধানদের (Household head) নির্বাচিত বিষয়ের উত্তর দাতা হিসাবে গন্য করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থান ও কাল ভেদে মানুষ ও সংস্কৃতিকে জানা। বিবর্তনবাদী ধারণা নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব বিজ্ঞানীদের গবেষণার জগৎও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কল্পনা কিংবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কোন কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ সমাজ বিজ্ঞানীগণ মানব সমাজের বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেলেও তারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ তথা ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে যথার্থ তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি।

বিবর্তনবাদী ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপরই তৎকালীন নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল। সংস্কৃতির গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীগণ প্রধানত ৫টি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতিমালার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের "সংস্কৃতি বা মানব সংস্কৃতি " গবেষণার মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে এই সব নীতিমালা। গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ব থেকে শুরু করে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা পর্যন্ত এইসব নীতিমালা পাথেয় হিসাবে পরিগণিত হয়। নীচে নৃবিজ্ঞানে গবেষণার মৌলিক নীতিমালাগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১) সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic View)

২) ক্ষেত্র গবেষণা (Fieldwork)

৩) সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা (Cultural Relativism)

৪) তাত্ত্বিক ধারণা গঠন (Theoretical Concept Building)

৫) তুলনামূলক বিশ্লেষন বা বহু সংস্কৃতির পর্যালোচনা (Comparative Analysis/Cross Cultural Analysis) (চৌধুরী ও রশীদ, ১৯৯৫, ৫৩)

সব ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাত্ত্বিক এবং কর্মোদ্দীপনামূলক গবেষণা যাই হোক না কেন, গবেষণা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব সমাজ এবং সাংস্কৃতিক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত চার ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বাস্তব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এই গবেষণায় ব্যবহৃত অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিগুলো হচেছ- ১। নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ২। কেসষ্টাডি ৩। জরিপ পদ্ধতি এবং ৪। পরিসংখ্যান পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

এর মধ্যে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কেসষ্টাডি পদ্ধতিকে গুনবাচক পদ্ধতি, জরিপ পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। নৃবৈজ্ঞানিক এবং কেসষ্টাডি পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষককে মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এরপর তিনি প্রশ্নমালা তৈরী করেন, তথ্যদাতা বা উত্তরদাতাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা ইত্যাদি করেন। এই কৌশলগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে গবেষক উক্তসমাজের একটি চিত্র আঁকেন, যেখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার উদ্দেশ্যমূলক বিষয়টি। গুনবাচক পদ্ধতির, বিশেষত নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করলে অনেক বেশী বিষয় সম্পৃক্ত তথ্য পাওয়া যায়, এখন এটা প্রমাণিত। এমনকি তা যদি বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ওপর হয় তাতেও একই ফলাফল বহন করে। এজন্য মনে করা হচ্ছে যে, নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার গবেষণায় সবচেয়ে বেশী উপযোগী। নৃবিজ্ঞানী Petri J. Pello (1970) এর মতে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষন
২) জীবন ইতিহাস সংগ্রহ
৩) কাঠামোগত সাক্ষাৎকার
৪) প্রশ্নমালা
৫) শ্রেণীকরণ এবং সারণীবদ্ধকরন
৬) শব্দার্থ তাত্ত্বিক বিভিন্ন কৌশল
৭) পরিকল্পনা পরিমাপন
৮) অন্যান্য মনোবৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি
৯) অনতি লক্ষ্য পরিমাপন
১০) মাঠ পর্যায়ের প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি
১১) বহুমুখী যান্ত্রিক গবেষণা
১২) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (pello, পৃ ২৫৬, ১৯৭০)

বর্তমান গবেষণাটি অনুসন্ধান এবং বর্ণনামূলক প্রকৃতির হওয়ায় গুণগত এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক উভয় ধরনের কৌশল এখানে সংযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সময় লেগেছে প্রায় ৩

Dhaka University Institutional Repository

বছর । এর মধ্যে গবেষনাক্ষেত্রে অবস্থান করা হয়েছে আট মাস সময়। বান্দরবান শহরের কাছাকাছি পাড়া সমূহ অবস্থিত হওয়ায় গবেষনা ক্ষেত্রে প্রতিদিন সকাল ১১ টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত অবস্থান করা হতো। বর্ষাকালে এ এলাকা সমূহে গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা অনেকটা অসম্ভব। এছাড়া রবিবার দিন তারা কোন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহন করা পছন্দ করেনা । এই দিনটিতে তারা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা এবং অবসর সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তাই গবেষনা পরিচালনায় প্রায় সকল রবিবারকে বাদ দেয়া হয়েছে। মাঠকর্মে থাকা অবস্থায় বোমদের বিবাহ ও মৃত্যুর ক্রান্তিকাল অনুষ্ঠানগুলোতে পর্যবেক্ষন ও অংশগ্রহন সম্ভব হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় এই গবেষনাটিতে আংশিক কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গভীরভাবে ক্ষেত্রানুসন্ধানের কৌশলগুলো ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কৌশল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণার প্রথম পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচন এবং উত্তরদাতা হিসাবে খানা প্রধানদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর গৌণ তথ্যের উৎস হিসেবে জেলা এবং উপজেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করার পাশাপাশি এবং গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রাম এবং খানা প্রধানদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এখানে আংশিক-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। গবেষণার তৃতীয় পর্যায়ে বম সমাজের বিশ্বাস ব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিকতা, বর্হিবিশ্বের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার প্রকৃতিগত বিশ্লেষণ অনুসন্ধানের সময়কালে সময়, স্থান ও প্রয়োজন অনুসারে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অংশগ্রহন মূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বমদের জীবন-যাপন পদ্ধতি কে গভীরভাবে এবং স্বজাতিত্ত্ব এই উভয় প্রক্রিয়ায় সমন্বিতভাবে পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাত্ত্বিকভাবে উচ্চতর কার্যকাঠামো ব্যবহার ব্যতিরেকে সমন্বিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী, গভীর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বাস্তব উপযোগীতার ওপর ভিত্তি করে। বিষয় সম্পর্কিত তথ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সাহায্যে একটি জরিপ করা হয়েছে। এটা ছিল মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের একটি সম্পূরক। প্রশ্নমালা পূরণ করার জন্য মাঠে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হয়েছিল। কিছু কিছু নির্বাচিত বাড়ীতে অনেক সময় গল্প ও আলাপ করে সময় অতিবাহিত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের অর্ন্তদৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়েছে। আমি তাদের সাথে গভীরভাবে মিশেছি এবং মাঝে মাঝে তাদের অনুভূতির সাথে একাত্ব হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য সমন্বিতভাবে কয়েকটি গবেষণা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। গভীর পর্যবেক্ষণ, অংশ গ্রহন মূলক পর্যবেক্ষণ, সুগঠিত প্রশ্নমালা তৈরি প্রভৃতি পদ্ধতিগুলো ও তার কৌশল সমূহ এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সম্পৃক্ত আরও প্রানবন্ত তথ্যের জন্য একটি ক্যামেরার সাহায্যে দৃশ্যমান চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে যা অধ্যয়নটিকে আরো বাস্তবভিত্তিক রূপায়নে সাহায্য করেছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি

একটি উপযোগী নকশা সূত্রবদ্ধ করার পর প্রত্যেক গবেষককে অবশ্যই চিন্তা করতে হয় মুল গবেষণার বিষয়ে সম্পৃক্ততার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায় এবং তার পদ্ধতি কি হবে। প্রতিটি বিষয় আদর্শগতভাবে গবেষণার সাথে সংযুক্ত । কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে পৃথকভাবে এবং এক এক করে অন্তর্ভূক্ত করা কঠিন, সময়সাপেক্ষ। এ কারণে এর ব্যবহার সাধারণত উৎসাহিত করা হয় না। অতএব, সমগ্রক থেকে একটি প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা একক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারন তথ্যদাতা নির্বাচনে নমুনায়ন একটি কার্যকর ও নিরপেক্ষ পদ্ধতির অন্তর্গত। নমুনায়ন হচ্ছে নমুনা নির্বাচনের কৌশল, অর্থাৎ নমুনায়ন হলো সমগ্রক হতে নমুনা বাছাই করার প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে বর্তমান অধ্যয়নে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নকে তথ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ক্ষেত্রে গবেষক নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা কাজের সুবিধা অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করে থাকে। বর্তমান অধ্যয়নে গবেষক উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে লাইমি গ্রাম ও ফারুক গ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কারন এই দুটি গ্রামই সমগ্রকের অবস্থান এতবেশী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্ট সাধ্য বিষয়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক গননাকৃত শুমারী অনুযায়ী লাইমি গ্রামের সর্বমোট জনসংখ্যা ৩৫৮ জন এবং ফারুক গ্রামের সর্বমোট জনসংখ্যা ৪৭৭ জন। অধ্যয়নের প্রারম্ভে এই দুটি গ্রামে খানা জরিপ কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সুবিধাজনক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নমুনা একক নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়নের নিঃসম্ভাবনা পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে তথ্যের উৎস হিসাবে নির্বাচিত লাইমিগ্রাম ও ফারুক গ্রাম হতে সর্বমোট খানা হতে ৫০টি খানা নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে পুরুষ ৪০ জন এবং মহিলা ১০ জন এর সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে।

যারা উক্ত গ্রাম, জনগোষ্ঠী ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ ধারনা রাখে এ ধরনের ৩ জনকে নির্ধারন করা হয়েছে। কেস স্টাডির নমুনা একক হিসাবে। উক্ত ৩ জনের মধ্যে ২ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ কৌশল

প্রতিটি গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহ কৌশল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই গবেষণাটিতে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। যথাঃ মূখ্যউৎস এবং গৌণ উৎস।

মূখ্য উৎস

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সরাসরি 'বোম' জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে যা প্রাথমিক উৎস। সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ব্যক্তিগত জরিপ, পর্যবেক্ষণ, কেস ষ্টাডি এবং জীবন ইতিহাসের মাধ্যমে এটি সম্পাদিত হয়েছে যা প্রাথমিক উৎস হিসাবে চিহ্নিত। প্রতিটি গৃহস্থালী একক এবং প্রতিটি উত্তরদাতার কাছ থেকে সরাসরি তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহ পরিচালিত হয়েছে নিবিড়ভাবে ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য দাতাদের সাথে কথোপকথন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। অতএব, গবেষণায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ তথ্যই প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত এবং নির্ভরযোগ্য। তথ্য সমূহকে আরও অধিক যথার্থতা যাচাই এবং গুরুত্ব অনুধাবন করে গবেষণার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

গৌণ উৎস

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথ্যের গৌণ উৎস হিসাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ এর বিভিন্ন রিপোর্ট, আদমশুমারী, গেজেটিয়ার, থানা সদর দফতরের কিছু নথিপত্র, প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ও তার সাথে বম সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সকল নথিপত্র উৎঘাটিত হয়েছে তা এই অধ্যয়নটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের মাধ্যমিক উৎসগুলোও ছিল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।

সুগভীর পর্যবেক্ষণ

গভীর পর্যবেক্ষণের তৃতীয় ধাপটি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় সুগভীর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। দুরুহ এবং গোপনীয় বিষয়সমূহ যথাসাধ্যভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অপ্রকাশিত বিষয়সমূহের বিভিন্ন পরিস্থিতি অবলোকনের মাধ্যমে উন্মোচন করে তা বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণাটিতে যে সব পদ্ধতি এবং কৌশল প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্বশর্তই হচ্ছে অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ। এটাই হচ্ছে প্রধান গবেষণা পদ্ধতি যার মাধ্যমে অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল সমূহ অগ্রসর হয়েছে। একটি সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী করার জন্য সুবিধাজনকভাবে অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ কিছু দিক থেকে সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা। অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ কিছু গুনগত মান ধরে রাখতে সক্ষম যা সাধারণ পর্যবেক্ষণে সম্ভব নয়। যেমন- দৈব অভিষ্ট লক্ষ্য, গভীর সচেতনতা, প্রশস্ত দৃষ্টিকোন, আভ্যন্ত রীন এবং বহিঃঅভিজ্ঞতা, প্রমাণ সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের অবস্থাতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। একটি সামাজিক অবস্থাকে সবসময় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, কার্যকলাপ এবং স্থান এর উপর নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জাতিতাত্ত্বিক অধ্যয়নে পর্যবেক্ষণ খুবই ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়।

নিম্নে জাতিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি চিত্র দেখানো হল।

চিত্র- তিন প্রকার পর্যবেক্ষণ এর সাথে পর্যবেক্ষণ সময়ের সম্পর্ক।

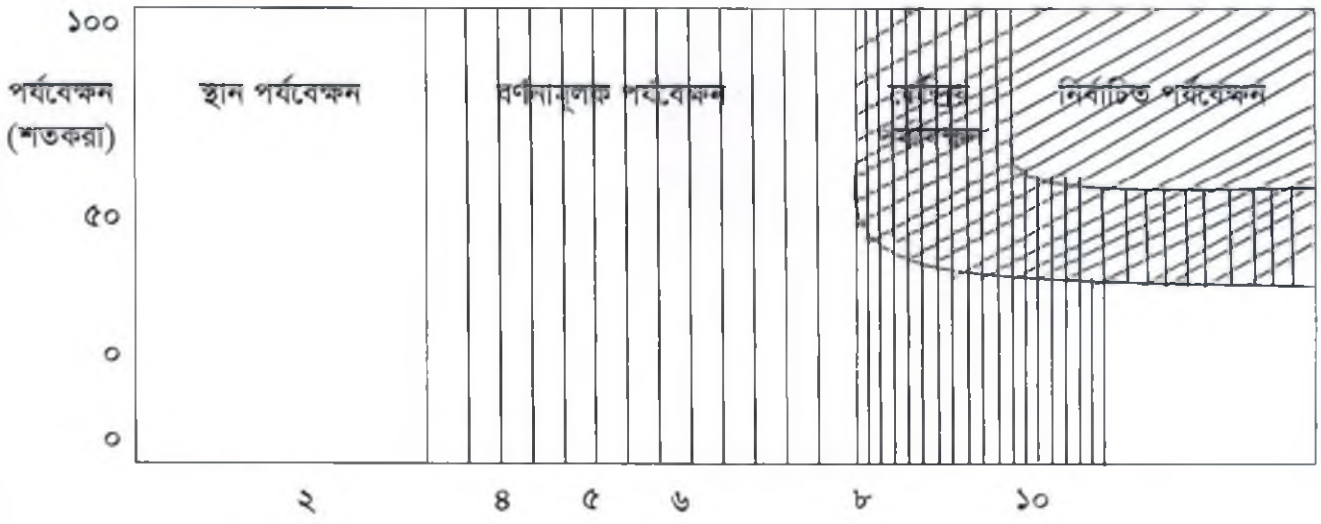

পর্যবেক্ষনের ক্রম পরিক্রমা

চিত্র-১ এ গবেষণায় ব্যবহৃত তিন প্রকারের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন ধরনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে বর্ণনামূলক পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য কৌশল

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এছাড়াও এই পদ্ধতিকে প্রধান উপজীব্য করে অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা, স্থিরচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতি।

তথ্যের গৌণ উৎস সমূহ

কিছু প্রকাশিত উপকরণ এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন উপকরণ যেমন বই, সংবাদপত্র, বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট, সামাজিক গবেষণার জার্নালসমূহ তথ্যের গৌণ উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তথ্যের গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার যথেষ্ট কম করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বল্প সংখ্যক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র বর্তমান গবেষণার সামাজিক সমস্যাকে প্রকৃতভাবে চিহ্নিত এবং অনুধাবন করার জন্য। এই সবকিছুই সমগ্র পরিস্থিতিকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বোঝার জন্য এবং তথ্যের আরও উন্নততর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। গবেষণার প্রকৃতি নির্বাচন করার পর উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য আনুষ্ঠানিক পত্র গঠন এবং এর পরবর্তীতে উত্তরদাতাদের নমুনায়ন করা হয়েছে, প্রথমতঃ পর্যবেক্ষণপূর্ব এবং দ্বিতীয়তঃ মূল গবেষণা কাল। অর্থাৎ 'বন' জীবনের অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতি। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আসল তথ্য জানার আগে গবেষণা কার্যক্রমের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার কার্যক্রম এবং এর নকশা উত্তরদাতাদের জন্য যথাযথ কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে একটি প্রশ্নমালা গঠন করা হয়েছে। প্রশ্নমালার একটা নমুনা প্রথমে যাচাই করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে নক্শায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। এরপর মূল প্রশ্নমালা গঠন করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ

তথ্য সংগ্রহের পর আর একটি দাবী গবেষককে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় তা হচ্ছে অশোধিত তথ্যসমুহকে সংগঠিত করা। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পর অশোধিত তথ্য সমূহকে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এনে বিশ্লেষণযোগ্য করা হয়। এরপর তথ্য বিশ্লেষণের উপযুক্ত কৌশল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। যে সব তথ্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে গৃহীত হয় তা সাধারণত যে কোন অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণের পূর্বে বিশেষভাবে সংগঠিত করা হয়। এরপর প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট নীতিমালায় বিভক্ত করা এবং যন্ত্রে ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী করা অর্থাৎ কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী করা যা সাধারণভাবে সবার জন্য বোধগম্য হয়। পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের আগে গৃহীত তথ্যসমূহকে কম্পিউটারে স্থাপন করা হয়েছে। গবেষককে সংগৃহীত তথ্য সমূহকে একটি নীতিমালায় স্থানান্তর এবং রূপান্তর করতে হয়। প্রায়শই এই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময়ক্ষেপন করে। পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণাটিতে তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য এই সকল প্রতিটি পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গবেষণায় অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বর্ণনামূলক। এর পরিপ্রেক্ষিতে একক চলক এর ওপর ভিত্তি করে তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যয়নটিতে অধিকাংশ চলকের পরিমাপ হচ্ছে নাম এবং ব্যপ্তি চলক। পারিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ, গঠন সংখ্যা বন্টন এবং কিছু নির্দিষ্ট সূচক সমুহকে আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে বোঝার জন্য শতকরায় প্রকাশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে 'বোম' সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ 'বোম' জনগোষ্ঠীর পরিচিতিমূলক আচরণ, খানা সমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যা সংগৃহিত এই গ্রামের খানা প্রধানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন মন্তব্য, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়াসমূহ সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সাক্ষাৎকারের সময় কিছু কাঠামোগত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোমদের সাধারণ বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিতকার মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, বিশ্বাস ব্যবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তালিকা, বর্ণনা এবং অন্যান্য তথ্য যা এই গবেষণা থেকে পূনরুৎপাদিত হয়েছে তা মূলত প্রাথমিকভাবে সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমূহের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনামূলক প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষনের আলোকে গবেষণাটিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ বোম জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সমাজকাঠামো এবং আচরণগত পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ার বর্ণনা এবং দ্বিতীয়তঃ বোমদের বিচ্ছিন্নকরণ সম্পর্কে চাপ এর সংসৃষ্টকরণ এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে খাপখাওয়ানো।

বর্তমান গবেষণাটি এর সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে বোম সমাজ ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতায় কোন ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ বা তাত্ত্বিক সাধারনীকরণ দাবী করে না। এখানে শুধু বোম সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সমুহ সাধিত হয়েছে এবং আসন্ন যে পরিবর্তনের দিকে অগ্রসরমান তাই উল্লেখিত হয়েছে। যা হোক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তন এবং এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত অধ্যয়নটি তাদের জীবনযাত্রার একটি জাতিতাত্ত্বিক বিবরণ যা জ্ঞানের শাখাকে প্রবৃদ্ধি, যৌক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা

সমগ্র মাঠ পর্যায়ের সময়কালে পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাপ্তিকরন পর্যন্ত একজন গবেষক হিসাবে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। এর মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা আছে যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেরকম কিছু সমস্যা উল্লেখ করা হলো। প্রথমতঃ ভাষাগত সমস্যা। বান্দরবান জেলা সদরের নিকটবর্তী বোম গ্রামগুলোর আধিবাসীরা বাংলা ভাষা আংশিক বুঝলেও অধিবাসীদের অনেকেই বাংলা বুঝে না। দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ী আঁকা বাঁকা রাস্তা। যদিও বোম গ্রাম সমুহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত, তথাপি প্রায়ই পাহাড়ী আঁকা-বাঁকা রাস্তা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দিতো। তৃতীয়তঃ যানবাহন সমস্যা প্রকট। যানবাহন গুলো এতবেশী লোকারন্য থাকতো যে, অনেক সময় দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ পাহাড়ী রাস্তা পাড়ি দিতে হয়েছে। তথাপি এখানকার নৃগোষ্ঠীর সহযোগীতামূলক আচরন গবেষণাকর্মকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভৌগলিক ও ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থা

বম নৃগোষ্ঠী

'আদিবাসী' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। আদি শব্দের অর্থ মূল এবং বাসী শব্দের অর্থ অধিবাসী। সুতরাং আদিবাসী শব্দের অর্থ হচ্ছে মূল অধিবাসী বা দেশীয় লোক। আদিবাসী বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা সাধারণভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করেন তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভূক্ত (মেসবাহ, পৃ ১৩, ২০০৭)। সমজাতীয় সংস্কৃতিই আদিবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এরা হচ্ছেন এক একটি সাংস্কৃতিক একক। প্রাচীন শাসক সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের মনুষ্যজাতি বলে অস্বীকার করা হয়েছে। ঔপনিবেশীক ব্রিটিশ শাসকরা আদিবাসীদের আদিম অধিবাসী, অনগ্রসর আদিবাসী ইত্যাদি বিশ্লেষণে বিশেষিত করেছে। আর্ন্তজাতিক শ্রমসংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী 'আদিবাসী হলেন তারাই যাদের আর্থসামাজিক অবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কম অগ্রসর এবং যাদের জীবন ধারা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিচালিত হয় তাদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে। স্বাধীনদেশের অর্ন্তভূক্ত মানব সম্প্রদায় যারা বর্তমান রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন, যাদের নিজেদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এমন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে তারা সে দেশে বসবাস করেন, অথচ সে দেশের জাতীয় কার্যাবলী পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রন করেন না তারাই হচ্ছেন আদিবাসী সমাজ' (প্রাগুক্ত, পৃ ১৩, ২০০৭)। নৃবিজ্ঞানীগনের মতে আদিবাসী বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা তাদের জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। আদিবাসী সদস্যদের মধ্যে একটা ঐক্যের অনুভূতি বিদ্যমান এবং সংহতিবোধ তীব্র। এছাড়াও এরা সংখ্যা লঘু জনগোষ্ঠী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এরকম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যারা আধুনিক রাষ্ট্রের উত্থান ও তাঁর বর্তমান সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পূর্ব হতেই ঐ দেশে বসবাস করে আসছে, যাদের সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং যাদের নিজেদের মধ্যে এ স্বাতন্ত্র্য বোধ বা ঐতিহ্য রক্ষা করার মানসিকতা বা ইচ্ছা রয়েছে, মূলত তারাই আদিবাসী বলে চিহ্নিত (প্রাগুক্ত, পৃ ১৩, ২০০৭)।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে বোম । তারা এখানে স্মরণাতীতকাল হতে বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলায় তাদের

Dhaka University Institutional Repository

আবাস হলেও সর্বাধিক সংখ্যক বোমরা বান্দরবানেই বসবাস করে। বোম শব্দের অর্থ বন্ধন। অতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি জনগোষ্ঠীর লোকেরা যাদের জীবন প্রবাহ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত ইত্যাদি প্রায় একই রকম তারা নিজেদের বোম নামে আখ্যায়িত করেন। এভাবে একটি সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর নাম হয় বোম (Loncheu, p-2, 2003)।

অতীতে বোমরা আরাকানে থাকতো। তখন আরাকানিরা এদের লাংগি বা লাংখে বলে ডাকতো। উপনিবেশিক শাসনামলে এদেশীয় ইংরেজ শাসকরা বোমদের কুকি নামে অভিহিত করতেন। ব্রিটিশ ও রোমান সাহিত্যে লেখকরা বমদের বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করতেন । যেমন- Bown-jus Ges Bounjhes (Phayre, 1945), Banjugee (Maerea, 1981), Banjoos (Barbe, 1845), Bawm, Bawm-Zo (Laorrain, 1940), Hutchinson (1906) বোমদের বানজুগি বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে বোম মানে হচ্ছে বনজঙ্গল আর জুগি মানে হচ্ছে বিচরনকারী। এই অর্থে বানজুগি বা বোমরা হচ্ছে বনজঙ্গলে বিচরনকারী গোষ্ঠী (Loncheu, p-2, 2003)। লালনাগ বোম ১৯৮১ সালে রাঙ্গামাটি পাবলিক লাইব্রেরীর সামাজিক অঙ্কুর এর ১ম সংখ্যায় 'উপজাতি পরিচিতি- বোম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে- পাংহয় ও সুনতলা নামক দুটি জনগোষ্ঠীর মিলনে বোমজাও শব্দটি গঠিত হয়েছে যার অর্থ হল সংযুক্ত জাতি। বর্তমানে বোম শব্দটির পরিবর্তে বম ব্যবহৃত হচ্ছে (সুগত, পৃ ৬২, ২০০১)। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা বোমদেরকে নানা নামে অভিহিত করে যেমন- চাকমা ও তঞ্চংগারা বোমদের কুকি বা কুগি, মারমারা ল্যাংগে, খুমী ম্রো ও খিয়াংরা ল্যাংখে বলে ডাকে। তবে বাংলাদেশে বসবাসরত এই জাতি নিজেদের বোম বলে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অতীতে বোমরা নিজেদের লাই বা লাইমি বলতো যার অর্থ মানুষ। পার্বত্য চট্রগ্রামের যে স্থানগুলোতে এরা বাস করে সে স্থানগুলোকে বমরাম বা লাইরাম বলে। এদের অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে এদের ভাষায় গানের কলি 'এরুপ-অকান লাইরাম পার দহতে হি' এর অর্থ কি সুন্দর আমাদের এই লাইমিদের এলাকা (রউফ,পৃ ৮০,২০০৪)।

নরগোষ্ঠীগত পরিচয়

পৃথিবীতে যে কয়েকটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীই সর্বাধিক। মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বসবাস। এ অঞ্চলের মঙ্গোলীয়রা চীন, তিব্বত, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিন কোরিয়া, বাংলাদেশ, জাপান, ভিয়েতনাম, সাইবেরিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, মালেয়শিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে বসবাস করে। মধ্য এশিয়া, চীনের জনগোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

এবং দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে দৈহিক গঠন এবং চেহারাগত দিক থেকে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রামের বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতে বসবাসরত বম আদিবাসীর দৈহিক গড়নের দিক থেকে দক্ষিন পূর্ব এশীয় বৃহত্তর মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর অর্ন্তগত। তাদের নাক চ্যাপ্টা, দাড়িগোঁফ অল্প, চোখের মনি কালো, মাথার চুল খাড়া এবং মোটা, উচ্চতা মাঝারি গড়নের। মঙ্গোলীয় ধারার এই বোমরা প্রকৃত অর্থে বনের সন্তান । পাহাড় ও বনকে তারা জীবনের মত ভালবাসে । বোমরা স্বভাবে অতি বিনম্র। পুরুষ ও মহিলারা উভয়েই পরিশ্রমী। বাঙালীরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সকল পরিচিত নৃগোষ্ঠী, প্রধানতঃ নিষাদ-ভেড্ডিড, মঙ্গোলীয়, আর্য, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতির সংমিশ্রন জাত একটি শঙ্কর জাতি। এদেশে বাঙালীদের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সমূহ, যেমন-চাকমা, মারমা, বম, কুকী ইত্যাদি। অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জন মিলে কালক্রমে বাঙালী জাতির সৃষ্টি করেছে (সুভাষ, ৪, ১৯৮৩) নিষাদ-ভিড্ডিড, মঙ্গোল, ইন্দো-আর্য, শক-পামিরীয়, মালব, চোড়, খাস, হূন, কুলিক, লাট, যবন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাক দ্বীপী, তুর্কী, হাবসী, মগ প্রভৃতি অসংখ্য রক্তধারায় জন মানুষের সম্মিলিত জন সভা বাঙালী জাতি। এই শঙ্কর বাঙালী জাতি পরিগ্রহ করেছে এক নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক রূপ ও পরিচয়। (নীহার রঞ্জন, ৪, ১৯৮৩)-যার নিরিখে তারা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত এদেশের বোম নৃগোষ্ঠীর সাথে একীভূত হয়নি। বান্দরবানের বমরা মঙ্গোলীয় মহানৃগোষ্ঠীভুক্ত এক ক্ষুদ্র জনসমাজ।

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠা মানুষদের চুল সোজা, খড়খড়ে ও কালো। মাথার আকৃতি গোল। নাক মাঝারি হতে চ্যাপ্টা, চোখের উপরের পল্লব সামনের দিকে ঝুলে থাকে। চোখের পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ, নাকের গোড়া অক্ষিকোটর হতে যথেষ্ট উন্নত নয়, কিন্তু কপোলতলের হাড় প্রশস্ত ও উন্নত বলে মুখ দেখে মনে হয় সমতল। এদের দাড়ি, গোফ-কম, চোখ ধূসর বা গাঢ় ধূসর। গায়ের রং-পীতাভ বা পীতাভ-বাদামী। দেহাবয়ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত হলেও পা খাটো বলে এদের খর্বাকৃতি দেখায়। (প্রাগুক্ত, ৫, ১৯৮৩) বাঙালীদের শঙ্কর বৈশিষ্ট্যের সাথে মঙ্গোলয়েডদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে সমতুলনা করা যায় না। মাঝারী দেহ প্রকৃতির বাঙালীরা নৃতাত্ত্বিক ভাবেই আলাদা। বাঙালীদের সাধারন মাথার গড় আকার লম্বাও নয় গোলাকারও নয়। নাক লম্বাও নয় চ্যাপ্টাও নয়। বাঙালীরা দীর্ঘাঙ্গীও নয়, কিংবা খর্বাকৃতিও নয়। চোখের পল্লব সুষম, ভাঁজ সুচারু। কপোলতলের হাড় মধ্যআঙ্গিকের। চুল খাড়া নয়, মধ্য প্রকৃতির। বাঙালীদের দাড়ি গোঁফ থাকে। চোখ কালো। গায়ের রং শ্যামলা। (প্রাগুক্ত, ৬, ১৯৮৩)-এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য বাঙালীরা পাঁচ মিশালী হয়েও স্বতন্ত্র এবং এই অর্থে মঙ্গোলীয়দের চাইতে পৃথক। (মজিদ, ৬৬, ২০০১)।

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক গঠনগত এ পার্থক্য খোলা চোখে স্পষ্ট বলে একজন মঙ্গোলীয় বম, একজন বাঙালী হতে নিজেকে পৃথকভাবে, অনুরূপ ভাবে একজন বাঙালীও সে অর্থে একজন 'বোম' মানুষের সাথে নিজেকে অনুরূপ ভাবে না।

বোম নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত

পার্বত্য চট্রগ্রামে বোমদের আগমন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে, সম্ভবত তাদের আদিনিবাস ছিল ব্রহ্মদেশের চিন্ পর্বত এলাকার দক্ষিনে তসন ও উত্তরে জৌ উপত্যকা ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আবার মায়ানমারে চিন্দুইন ও ইরাবতী নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বোমদের বসবাস করতে দেখা যায়। ধারনা করা হয় পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠী পনের শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এখানে আসতে থাকে (সুগত, পৃ ৬০, ২০০১)। ১৭৮০ সালে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম এর কিছু এবং আবাসন নীতির গঠন সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির হয়ে উঠে। ফলে ভারতের এই প্রদেশসমূহে বসবাসরত কিছু জনগোষ্ঠীকে জোর করে বের করে দেয়া হয় যারা পার্বত্য চট্রগ্রামের দক্ষিনে এসে বসবাস শুরু করে (গোস্বামী ১৯৮৯)। অন্যদিক ১৭৮৪ সালে বার্মা আরাকান রাজ্যের উপর উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে যুদ্ধাহত একদল লোক আরাকান হতে পার্বত্য চট্রগ্রামে অভিগমন করে। ১৭৯৭ সাল নাগাদ প্রায় ৪০,০০০ লোক আরাকান প্রদেশ হতে এদেশে চলে আসে। এই গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে- চাকমা, পাঙ্খোস, বানভুগি (বম) এবং ম্রো। বোমরা ১৮ শতকে পার্বত্য চট্রগ্রামে আসে। পরে ১৮৩৮ সালে আরাকানে লিয়ান কুং নামে একজন বম নেতা হেংক্রেই নামক খুমী সর্দারের গ্রাম আক্রমন করে লিয়ান কুংকে শাস্তি দেয়ার জন্য ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা আরাকানে অবস্থান নেয়। ব্রিটিশ সৈন্যদের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য লিয়ানকুং আরাকানেব পাহাড়ী অঞ্চলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৮৩৮-৩৯ সালের দিকে সে এবং তার দল পার্বত্য চট্রগ্রামে এবং বান্দরবানের রুমা উপজেলায় অবস্থান নেয় সেখানকার সিয়ানপ্রো নামক বোমাং রাজার অনুমতিতে। লিয়ানকুং এভাবে খুমী বন্দীদের মুক্তি দেয় এবং তাদের আরাকানে ফেরত পাঠায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে তারা একটি দূর্বল গোত্রে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে তাদেরকে অনেক সমস্যা এবং অনাকাংখিত পরিস্থিতির সম্মুক্ষীন হতে হয়। এভাবে তারা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন (সুগত, পৃ ৬১, ২০০১)।

বোমরা নিজেদের সম্মিলিত জনগোষ্ঠী মনে করে। তাদের মতে, বোম মানে হচ্ছে অখন্ড। অতীতে বোমরা ছিল সাহসী যোদ্ধা। অধিকাংশ যুদ্ধে তারা জয়লাভ করতো এবং শত্রুদের পরাস্ত করে নিজেদের আয়ত্তে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে আসতো। অতঃপর তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতো। সামাজিকভাবে এই দাসগণ সর্বদাই যোদ্ধা কিংবা তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকতো। তখনকার বোম সমাজের আইন অনুসারে একটি মোরগকে বলী দেয়ার মাধ্যমে এই দাসকে মোরগের রক্তে সিক্ত করার পরই তাকে পারিবারিক দাস হিসাবে গন্য করতে পারতো এবং এরপর থেকেই দাসগন উক্ত পরিবারের নাম ব্যবহার করতে পারতো। এভাবেই ধীরে ধীরে বোম যোদ্ধা এবং তাদের দাসগন একই সাথে বম সমাজের প্রথাগত আইন মেনে চলতে থাকে। মূলতঃ এই কারনেই তাদের বোম বা বোমাজো বলে। এর মানে হচ্ছে একতাবদ্ধ বা সম্মিলিত গোষ্ঠী। সাধারণত বোমরা পাহাড়ের চূড়া ও অরণ্যের অত্যন্ত গভীরে বসবাস করতে পছন্দ করে। এরা শিকারী। অধিকাংশ সময় শিকার যন্ত্রহাতে জঙ্গলেই তাদের বেশী দেখা যায়।

বোম নৃগোষ্ঠীর ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রতিবেশ

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- (১) টারশিয়ারি পার্বত্য অঞ্চল (২) প্লাইষ্টোসিনকালের সোপান (৩) সাম্প্রতিক প্লাবন সমভূমি (বাতেন, পৃ ৬, ২০০৩)। বোম অধ্যুষিত বান্দরবান জেলা টারশিয়ারী পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। ওলিগোসিন ও মধ্য মায়োসিন ভূ-তাত্ত্বিক যুগের তলানি দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো বেলে পাথর, স্লেট পাথর ও কাঁদার সংমিশ্রনে গঠিত। এই অঞ্চলের পাহাড়গুলো উত্তরদক্ষিণে প্রলম্বিত ও ভাঁজগ্রস্ত এবং চিরসবুজ বৃক্ষে আচ্ছাদিত। পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬০০ মিটার এবং এই উচ্চতা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশ বেড়েছে। বান্দরবান জেলায় প্রায় ১২৩০ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন কেউক্রাডং বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হিসেবে খ্যাত। তবে বর্তমানে বান্দরবানেই আরও একটি উঁচু চূড়া আবিস্কৃত হয়েছে, এর নাম তাজিংডং এবং এর উচ্চতা ১২৩১ মিটার। এই পাহাড়ী এলাকার প্রধান নদী কর্নফুলী, শংখ বা সাংগু, মাতামুহুরী ও নাফ। বিভিন্ন পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিম দিকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এসব প্রধান নদী থেকে কতগুলো উপনদীর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- কাসলং, চেংগী, ঠেগা, বড়হরিণা, সুবলং, রেইংখ্যং, মাইনি, গংগারাম ও শিজক। এছাড়াও এই অঞ্চলে তিনটি প্রাকৃতিক হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলো হচ্ছে বগাকাইন, রাইখ্যংহ্রদ ও নুনছড়ি মাতাইমুহুরী। এ অঞ্চলে কয়েকটি জলপ্রপাতও আছে। কর্নফুলী নদীতে বরকল ও উঠানচাতারাতে দুটি, চিম্বুক পর্বত শ্রেণীর লুলেইংশৃঙ্গের নিকট, ধলগিরি পর্বত শ্রেণীর লংট্রাই শৃংগের নিকট কয়েকটি জলপ্রপাত রয়েছে। বান্দরবানের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এ অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অবশ্য শীতকালে আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অবশ্য শীতকালে আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বান্দরবানের মানচিত্রে গবেষিত লাইমিপাড়া ও ফারুকপাড়া

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে পাহাড়, নদী, অরণ্য ও ঝরনার মায়াবী লীলা নিকেতন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ভৌগলিকভাবে উত্তর অক্ষাংশের ২১০৩৫' থেকে ২৩০৪৫', এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১০৪৫' থেকে ৯২০৫২' পর্যন্ত এ অঞ্চল অবস্থিত। এর আয়তন ১৩,১৮১ বর্গকিলোমিটার (বাতেন, পৃ ১৩, ২০০৩)। এই অঞ্চলের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরপূর্বে ভারতীয় মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিণপূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণ পশ্চিমে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা (বাতেন, পৃষ্টা ১৪-১৫, ২০০২)। ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুসারে প্রশাসনিকভাবে বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলা ৩২টি ইউনিয়ন, ১৪৮২টি গ্রাম, ১টি পৌরসভা রয়েছে। বান্দরবান জেলার উপজেলাগুলো হচ্ছে বান্দরবান সদর উপজেলা, আলী কদম উপজেলা, লামা উপজেলা, নাইক্ষংছড়ি উপজেলা, রোয়াংছড়ি উপজেলা, রুমা উপজেলা এবং থানচি উপজেলা। বান্দরবানের সর্বমোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২,৯২,৯০০ জন (শুমারী ২০০১)।

বান্দবানের অতীত ইতিহাস এখনও সুস্পষ্ট নয়। এই অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপনকারী আদি ও মূল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত ইতিহাসও একইভাবে অস্পষ্ট। মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীভূক্ত লোকেরা আজকের বান্দরবানের প্রধান জনগোষ্ঠী ও আদি বাসিন্দা হিসাবে চিহ্নিত। তবে তাদের আগমন কাল এখনও সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১২টি নৃগোষ্ঠীর বসবাস। এরা হচ্ছে চাকমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তনচংঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খেয়াং, খুমি, লুসাই (রউফ, পৃ ১২, ২০০৪)। এই ১২টি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বমরা হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী যারা বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে আসছে। মূলত বোমরা বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা এবং রুমা উপজেলায় বসবাস করে। বমরা যে স্থানগুলোতে বসবাস করে এগুলো বমপাড়া হিসেবে পরিচিত। সাধারণভাবে পাড়া বলতে বুঝায় কতকগুলো বসতবাড়ীর পাশাপাশি অবস্থান। এক্ষেত্রে বসতবাড়ীর সংখ্যা কখনো ৩০/৪০ টি অথবা তার চেয়ে বেশীও হতে পারে। অন্যদিকে গ্রাম বলতে বুঝায় কতকগুলো বসতবাড়ীর পাশাপাশি অবস্থান যার দুরত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে হেটে অতিক্রম করা যায় এবং ঐ এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞাতি সম্পর্ক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রমে ঐক্যভাব বিরাজমান থাকে। এক্ষেত্রে বসত বাড়ীর সংখ্যা ৮০ হতে ১০০ পর্যন্তও হতে পারে। তবে প্রশাসনিকভাবে ক্ষুদ্র ইউনিট হচ্ছে মৌজা, যা ভূমি জরিপের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পরিচালিত হয়। 'গ্রাম' এর অতি সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে 'মৌজা'। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হচ্ছে বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় মৌজার চেয়ে গ্রাম বড় হয়ে থাকে (শুমারী রিপোর্ট ২০০১)। বান্দরবান জেলায় আদিবাসীরা সাধারণত যে এলাকায় বসবাস করে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোকে তারা পাড়া বলে অভিহিত করে। তাদের এ ধরনের পাড়া গুলোর বসতবাড়ীর সংখ্যা কখনো ২৫/৩০টি আবার কখনও ৮০/১২০টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই তাদের এই 'পাড়া'কে গ্রাম হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন- লাইমি পাড়া গ্রাম (এটি বোম অধ্যুষিত একটি এলাকা)। এদের গ্রামগুলো দেখতে অনেকটা গুচ্ছগ্রামের মত যা বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে তৈরি করা হয়েছে তেমনি দুটি গ্রামকে নির্বাচিত করা হয়েছে এ অধ্যয়নের জন্য। সাধারনত পাড়া ও গ্রাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা এবং রুমা উপজেলায় বমদের সর্বমোট ১৩টি গ্রাম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে লাইমিগ্রাম, ফারুকগ্রাম, শেরন গ্রাম, গেৎসিমনি গ্রাম, মার্মা গ্রাম, হাতীভাঙ্গা গ্রাম, এগেন গ্রাম, বেথেল গ্রাম, দাজিলিং গ্রাম, মুনলাই গ্রাম, সাইকট গ্রাম, সুনসং গ্রাম। এই তেরটি গ্রামকে অবস্থান অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা যেতে পারে। গ্রামগুলো হচ্ছে-বান্দরবান সদর হতে চিম্বুক পাহাড়ে যাওয়ার পথে বম গ্রাম সমূহ, বান্দরবানের রুমা উপজেলার বম গ্রাম সমূহ ও রুমা বাজার হতে কেউক্রাডং পাহাড়ে যাওয়ার পথে বোম গ্রাম সমূহ।

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বোম গ্রাম সমূহের অবস্থান দেখানো হলঃ

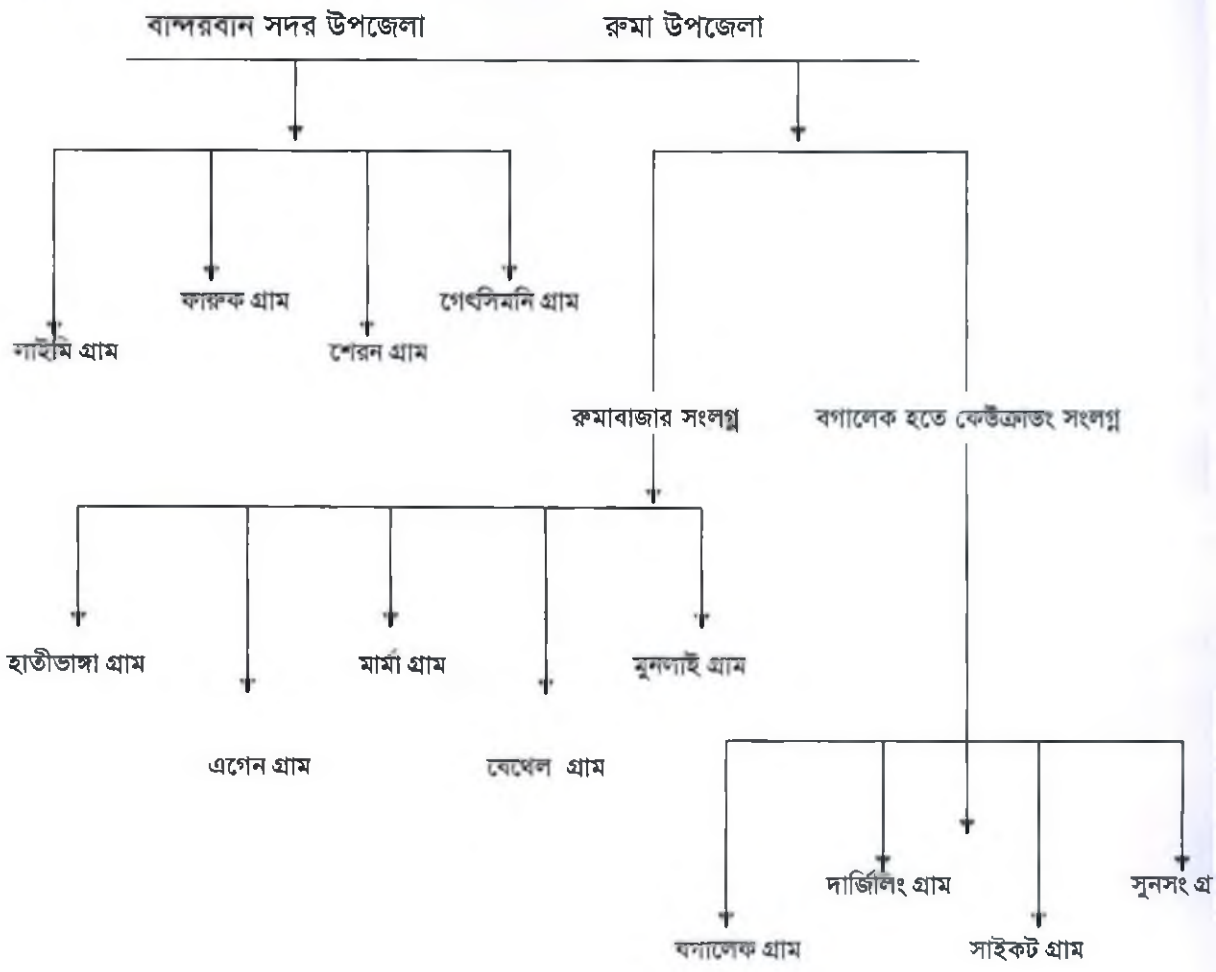

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রামগুলো বান্দরবান জেলা সদরের বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বান্দরবান সদর হতে চিম্বুক পাহাড়ে যাওয়ার পথে চারটি বোম গ্রাম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে লাইমি গ্রাম, ফারুক গ্রাম, শেরন গ্রাম, গেৎসিমনি গ্রাম। বান্দরবান সদর হতে চিম্বুক পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথে প্রথমেই লাইমি গ্রাম অবস্থিত। এটি বান্দরবান সদর হতে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বান্দরবান সদর হতে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফারুক গ্রাম । এই এলাকায় 'শৈলপ্রপাত' রয়েছে যা একটি পাহাড়ী ঝর্ণা। এটিকে দেখতে অনেক পর্যটক এখানে আসে। তাছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজে এর পানি ব্যবহার করে। বান্দরবান সদর হতে চিম্বুকের পথে ৯ কিঃমিঃ দুরে শেরন গ্রাম অবস্থিত। এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম হচ্ছে গেৎসিমনি গ্রাম। এই দুটি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। বান্দরবান সদর হতে এই গ্রাম গুলোতে যাওয়ার প্রধান যানবাহন হচ্ছে চাঁদের গাড়ী; এটি একটি বিশেষ ধরনের জীপ। এছাড়াও বর্তমানে একটি বাস সার্ভিসও রয়েছে। তবে সীমিত ক্ষেত্রে টেম্পোও এসব এলাকার যাত্রী বহন করে নিয়ে যায়। বান্দরবানের রুমা উপজেলায় ৫টি বোম গ্রাম রয়েছে। এগুলো রুমা বাজারের আশে পাশে অবস্থিত। বান্দরবান সদর হতে বাসে অথবা চাঁদের গাড়ী করে কক্ষইংজরী নামক স্থানে আসতে হয়। তারপর সেখানে হতে নৌকা বা ট্রলার দিয়ে রুমা বাজারে আসতে হয়। বান্দরবান হতে এখানে আসতে সময় লাগে প্রায় ৫ ঘন্টা। রুমা বাজার হতে ১ কিঃমিঃ দূরে হাতীভাঙ্গা বোম পাড়া গ্রাম। এটি একটি ছোট গ্রাম। এখানে বোম বসতি কম। রুমা বাজার হতে ২কিঃমিঃ দুরে হচ্ছে মার্মা গ্রাম। এই গ্রামটি রাস্তার দুই পাশে অবস্থিত। এক পাশে মার্মা নৃগোষ্ঠীর থাকে অন্য পাশে হচ্ছে বোম বসতি। রুমা বাজার হতে ৩ কিঃমিঃ দূরে বেথেল গ্রাম অবস্থিত। রুমা বাজার হতে ৮ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত মুনলাই গ্রাম। এই গ্রাম গুলো হতে রুমা বাজারে আসতে হয় পায়ে হেটে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এক গ্রাম হতে অন্যগ্রামে পায়ে হেটেই চলা ফেরা করে। রুমা বাজার হতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেউক্রাডং যাওয়ার পথে হচ্ছে বগালেক গ্রাম। এটি একটি সুপেয় জলাধার যা পর্যটকদের খুবই আকর্ষন করে। প্রতিবছর অনেক পর্যটক এখানে আসে। বগালেক হতে কেউক্রাডং যাওয়ার পথে দার্জিলিং গ্রাম। কেউক্রাডং পাহাড়ের সাথে সাইকট গ্রাম। কেউক্রাডং পাহাড়ের পরে হচ্ছে সুনসুং গ্রাম। এটি সর্ববৃহৎ বমগ্রাম। এতদ অঞ্চলের অধিবাসীদের কোন ধরনের যানবাহন নেই। তাদের রুমা বাজারে পায়ে হেটে যেতে হয়। এখানকার অধিবাসীদের জীবন ধারাও অত্যন্ত সাধারন। এদের প্রতিটি গ্রামে একটি করে চার্চ রয়েছে। যা তারা নিজেরাই পরিচালনা করে। অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এখানকার বোম বসতিগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের পানীয় জলের জন্য বিভিন্ন পাহাড়ী ঝর্ণার উপর নির্ভর করে। একমাত্র বাজার হচ্ছে রুমা বাজার। এখানে রুমা বাজার সংলগ্ন গ্রাম সমূহ এবং কেউক্রাডং সংলগ্ন

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম সমূহ হতে অধিবাসীরা বাজার করতে আসে। রুমা বাজারে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, যা এতদ অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থাও ভাল নয়। ১৯৮৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত বান্দরবান হতে নৌকায় করে রুমা উপজেলায় আসতে হতো। ১৯৯০ সালে একটি কাঁচা রাস্তা হয় যা পায়ে হেঁটে চলাচল করা যেতো। ৯০ এর পর হতে বান্দরবান হতে রুমা পর্যন্ত পাকা রাস্তা করা হয়। এই অঞ্চলের একমাত্র যানবাহন ছিল চাঁদের গাড়ী। তবে বর্তমানে বান্দরবান সদর হতে কক্সইংজরি পর্যন্ত বাস চলাচল করে। অতঃপর নৌকা বা ট্রলারে করে সাংগু নদীর পথে রুমা বাজারে যেতে হয়। রুমা বাজার সংলগ্ন এলাকাগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত হওয়ায় তা অবলোকন করার জন্য পর্যটকরা এখানে আসে। পর্যটকরা বগালেক, রিঙ্গুক ঝরনাধারা, কেউক্রাডং পাহাড় পরিদর্শনে আসে। এ অঞ্চলের পর্যটকদের আসা এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনধারার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষতঃ পর্যটকদের উপর ভিত্তি করে বগালেক গ্রামে দুটি খাবার হোটেল এবং দুটি আবাসিক হোটেল গড়ে উঠেছে। এছাড়াও 'গাইড' হিসাবে যুবকদের মধ্যে একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা পর্যটকদের পাহাড়ী পথ চিনিয়ে রুমা বাজার হতে কেউক্রাডং পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরা বান্দরবান শহরের পর্যটন এলাকাগুলোতেও কাজ করে। বান্দরবানের এই বোম অধিবাসীদের জীবনধারা অতি সাধারন। তারা কঠোর পরিশ্রমী। তাদের মূল অর্থনৈতিক জীবিকা জুম চাষ। এছাড়াও তারা অন্যান্য পেশায়ও কাজ করে থাকে। যদিও বর্তমানে বোমরা খৃষ্ট ধর্মে দিক্ষীত হয়েছে তথাপি তারা তাদের পুরানো ঐতিহ্য ও রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এগুলো গুরুত্বের সহিত পালন করে থাকে। বর্তমানে রুমা বাজার পর্যন্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক এসেছে যা তাদের জীবনে দারিদ্রতা, অনগ্রসরতা আরও দুর করবে বলে তারা মনে করেন। বান্দরবান জেলার তেরটি বোম গ্রামের মধ্যে বর্তমান অধ্যয়নটি দুটি গ্রামে সম্পাদন করা হয়েছে। যথা- ১। লাইমি গ্রাম ২। ফারুক গ্রাম। নিম্নে এ গ্রামগুলোর থেকে সংগৃহিত তথ্য সমূহ সন্নিবেশিত করা হলো।

লাইমি গ্রাম

বান্দরবান জেলা সদরের অন্তর্গত লাইমি গ্রাম। এটি বোম অধ্যুষিত এলাকা। বান্দরবান শহরে থেকে চিম্বুক পাহাড়ে যাওয়ার পথে সর্বপ্রথম এই বমপাড়া গ্রামটি অবস্থিত। বান্দরবান শহর হতে এটি ৭ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। লাইমি গ্রামটি রাস্তার উভয় দিকে বিন্যস্ত। ১৯৮০ সালে লাইমি নামক একব্যক্তি এই পাড়ার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির নাম অনুসারে এর নামকরন হয় লাইমি গ্রাম। এই গ্রামে ৪২টি পরিবারের বসবাস। সর্বমোট জনসংখ্যা ৩৫৮ জন। এই গ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি ভিত্তিক জুম চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা (সুত্র বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক গ্রাম সমীক্ষা রিপোর্ট)। লাইমি গ্রামের সর্বমোট জনসংখ্যাকে একটি টেবিল আকারে দেখানো হলঃ-

সারণী নং ০১ লাইমি গ্রামের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ

বয়স	পুরুষ	শতকরা	মহিলা	শতকরা	সর্বমোট	মোট জনসংখ্যার শতকরা
০-১৪	৫১	২৭.১৩	৩১	১৮.২৪	৮২	২২.৯০
১৫-৩০	৫৬	২৯.৭৯	৫২	৩০.৫৯	১০৮	৩০.১৭
৩১-৪৫	৩৮	২০.২১	৪০	২৩.৫৩	৭৮	২১.৭৯
৪৬-৬০	৩০	১৫.৯৬	৩৮	২২.৩৫	৬৮	১৮.৯৯
৬১-এর উর্ধ্বে	১৩	৬.৯১	০৯	৫.২৯	২২	৬.১৫
সর্বমোট	১৮৮	১০০	১৭০	১০০	৩৫৮	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

১নং সারণীতে লাইমি গ্রামে বসবাসকারী ০-১৪ বছরের পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ২৭.১৩% ও ১৮.২৪%, ১৫-৩০ বছর পর্যায়ের পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ২৯.৭৯% ও ৩০.৫৯%, ৩১-৪৫ বছর পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ২০.২১% ও ২৩.৫৩%, ৪৬-৬০ বছরের পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ১৫.৯৬% ও ২২.৩৫% এবং ৬১ বছর এর উর্ধ্বে পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে ৬.৯১% ও ৫.২৯%। উক্ত গ্রামে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা বেশী।

সারণী নং ০২ লাইমি গ্রামে উত্তরদাতা পরিবারের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ

০-১৪	১৮	৩৯.১৩	১২	২৮.৫৭	৩০	৩৪.০৯
১৫-৩০	১৩	২৮.২৬	১৪	৩৩.৩৩	২৭	৩০.৬৮
৩১-৪৫	১১	২৩.৯১	৯	২১.৪৩	২০	২২.৭২
৪৬-৬০	৪	৮.৭০	৫	১১.৯০	৯	১০.২২
৬১-এর উর্ধ্বে	-	-	২	৪.৭৬	২	২.২৭
সর্বমোট	৪৬	১০০	৪২	১০০	৮৮	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

২ নং সারণী অনুসারে অধ্যয়নকৃত লাইমী গ্রামের নমুনা একক ১৫টি পরিবারের বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার পুরুষ সর্বমোট ৫২.২৭% এবং মহিলা সর্বমোট ৪৭.৭২%। ০-১৪ বৎসর বয়সের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন যাহা মোট জনসংখ্যা ৩৪.০৯%। ৬১ বৎসর এর উর্ধ্বে ২.২৭%। লাইমি গ্রামের কর্মক্ষম জনসংখ্যা এবং অধ্যয়নকৃত পরিবারের কর্মক্ষম জনসংখ্যার তুলানাকালে দেখা যায় যে, উক্ত পরিবার গুলোতে শিশু ও কর্মহীন জনসংখ্যা আধিক্যতা রয়েছে।

অধ্যয়ন কালে লাইমি পাড়ায় বোম পরিবারের আকার হচ্ছে দু'ধরনের। এগুলো হচ্ছে একক পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। একক পরিবার সমূহে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানাদি সহ বসবাস করে এবং এর সদস্য সংখ্যা সর্ব নিম্ন ৩ হতে ৭ জন। অন্যদিকে বর্ধিত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী তাদের বিবাহিত সন্তানাদি ও নাতি নাতনীসহ একত্রে বসবাস করে। এ সকল পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ হতে শুরু করে ১২ জন পর্যন্ত।

সারণী নং ০৩ উত্তরদাতা পরিবারের ধরন ও জনসংখ্যা ঃ

পরিবারের ধরন	খানার সংখ্যা	শতকরা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শতকরা
একক পরিবার	৯	৬০	৩৪	৩৮.৬৪
বর্ধিত পরিবার	৬	৪০	৫৪	৬১.৩৬
সর্বমোট	১৫	১০০	৮৮	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

সারণী নং ০৩ অনুয়ায়ী লাইমি গ্রামে একক পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। অধ্যয়নকৃত ১৫টি পরিবারের মধ্যে ৯টি (৬০%) একক পরিয়ার এবং ৬টি (৪০%) বর্ধিত পরিবার। সর্বমোট জনসংখ্যা ৮৮ জন। এর মধ্যে ৯ টি একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন (৩৮.৬৪%) এবং ৬টি বর্ধিত পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫৪ জন (৬১.৩৬%)। উক্ত গ্রামে পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.৮৭।

লাইমি গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে। অতীতে এরা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনগ্রসর থাকলেও বর্তমানে শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে আসছে। লাইমি পাড়া গ্রামের অধ্যয়নকৃত পরিবার গুলোর সদস্যদের শিক্ষার হার দেখানো হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ০৪ লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষিত জনসংখ্যা ঃ

শিক্ষার স্তর	ছাত্র	শতকরা	ছাত্রী	শতকরা	সর্বমোট	মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা
প্রাথমিক স্তর(১ম-৫ম)	২৫	৫৪.৩৫	২১	৬৭.৭৪	৪৬	৫৯.৭৪
মাধ্যমিক স্তর(৬ষ্ঠ-১০ম)	১২	২৬.০৯	৮	২৫.৮১	২০	২৫.৯৭
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ- দ্বাদশ)	৭	১৫.২২	১	৩.২২	৮	১০.৩৯
স্নাতক পর্যায়	২	৪.৩৪	১	৩.২২	৩	৩.৯০
	৪৬	১০০	৩১	১০০	৭৭	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

সারণী নং ৪ এ দেখা যায় যে ১৫ টি পরিবারের ৭৭ জন সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ৪৬ (৫৯.৭৪%), মাধ্যমিক স্তরে ২০ (২৫.৯৭%), উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮ (১০.৩৯%), স্নাতক পর্যায়ে ৩ (৩.৯০%) শিক্ষা গ্রহন করেছে।

সারণী নং ০৫ উত্তরদাতার পেশার ধরন ঃ

পেশার ধরন	খানার সংখ্যা	কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি	শতকরা
চাকুরীজীবি (সরকারী প্রতিষ্ঠান)	১	১	২.০৮
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫	৯	১৮.৭৫
জুম চাষ	৮	৩২	৬৬.৬৭
অন্যান্য	১	৬	১২.৫
সর্বমোট	১৫	৪৮	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

লাইমি গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যগত জুম চাষ ভিত্তিক কৃষিতে নির্ভরশীল। তবে এমন কিছু গৃহস্থালীর সদস্য রয়েছে যারা চাকুরীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায় জড়িত। পরিবারের মহিলারা সব্জি চাষ করে থাকে এবং সীমিত ভাবে এগুলোকে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে দেখা যায়। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, বমদের ঐতিহ্যগত পেশার মধ্যে বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তাদের পেশার কারনে আন্তঃ ও বহির্বিশ্বের সাথে একটি সামাজিক যোগসূত্র তৈরী হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফারুক গ্রাম

বান্দরবান জেলা সদরের অন্তর্গত হচ্ছে ফারুক গ্রাম। বান্দরবান সদর হতে ৮ কিলোমিটার উত্তরে চিম্বুক পাহাড়ের যাওয়ার পথে এটি অবস্থিত। এই গ্রামটি লাইমি গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম। ১৯৮২ সাল হতে এ গ্রামে বোম নৃগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। এই গ্রামের নামকরন নিয়ে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ফারুক খান নামক বান্দরবান জেলার একজন জেলা প্রশাসক এখানে একটি পোশাক তৈরীর কারখানা স্থাপন করে কিছু বোম পরিবার এবং মুরং পরিবারকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করেন। পরবর্তীতে এই জেলা প্রশাসকের নাম অনুসারে এ পাড়ার নামকরন হয় 'ফারুক গ্রাম'। প্রথম দিকে ফারুক গ্রামে বোম নৃগোষ্ঠীর সাথে কিছু মুরং পরিবার থাকলেও পরবর্তীতে মুরং পরিবারের সদস্যরা এখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে এটি বোম অধ্যুষিত এলাকা। এই গ্রামটি দুটিভাগে বিভক্ত, উত্তর ফারুক গ্রাম এবং দক্ষিণ ফারুক গ্রাম। উত্তর ফারুক গ্রামে ৫২টি পরিবার এবং দক্ষিন ফারুক গ্রামে ৪৫টি পরিবার বসবাস করে। এখানকার সর্বমোট জনসংখ্যা ৪৭৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ২২১ জন এবং মহিলা ২৫৬ জন। নিম্নে ফারুক গ্রামের জনসংখ্যা দেখানো হলঃ

সারণী নং ০৬ ফারুক গ্রামের বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ

বয়স	পুরুষ	শতকরা	মহিলা	শতকরা	সর্বমোট	বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা
০-১৪	৭৭	৩৪.৮৪	৯৭	৩৭.৮৯	১৭৪	৩৬.৪৮
১৫-৩০	৫৭	২৫.৭৯	৯০	৩৫.১৬	১৪৭	৩০.৮২
৩১-৪৫	৪০	১৮.১০	৩৩	১২.৮৯	৭৩	১৫.৩০
৪৬-৬০	৩৭	১৬.৭৪	৩০	১১.৭২	৬৭	১৪.০৫
৬১-এর উর্ধ্বে	১০	৪.৫২	৬	২.৩৪	১৬	৩.৩৫
	২২১	১০০	২৫৬	১০০	৪৭৭	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

সারণী অনুয়ায়ী ০-১৪ বছরের পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ১৭৪ (৩৬.৪৮%) জন, ১৫-৩০ বছরের জনসংখ্যা ১৪৭ (৩০.৮২%) জন, ৩১-৪৫ বছরের জনসংখ্যা ৭৩ (১৫.৩০%) জন, ৪৬-৬০ বছরের

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ৬৭ (১৪.০৫%) জন এবং ৬১এর উর্ধ্বে পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ১৬ (৩.৩৫%) জন। উক্ত গ্রামে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ৬০%।

সারণী নং ০৭ ফারুক গ্রামের উত্তর দাতা পরিবারের বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা ঃ

বয়স	পুরুষ	শতকরা	মহিলা	শতকরা	সর্বমোট	বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা
০-১৪	২২	২২.৬৮	১৩	১৪.৯৪	৩৫	১৯.০২
১৫-৩০	২৪	২৪.৭৪	২৩	২৬.৪৪	৪৭	২৫.৫৪
৩১-৪৫	৩০	৩০.৯৩	৩২	৩৬.৭৮	৬২	৩৩.৭০
৪৬-৬০	১৯	১৯.৫৯	১৭	১৯.৫৪	৩৬	১৯.৫৭
৬১-এর উর্ধ্বে	০২	২.০৬	২	২.৩০	০৪	২.১৭
	৯৭	১০০	৮৭	১০০	১৮৪	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

৭নং সারণী অনুযায়ী গবেষিত ফরুক গ্রামের ৩৫টি পরিবারের ০-১৪ বছরের সর্বমোট জনসংখ্যা ৩৫ (১৯.০২%) জন, ১৫-৩০ বছরের জনসংখ্যা ৪৭ (২৫.৫৪%) জন, ৩১-৪৫ বছরের জনসংখ্যা ৬২ (৩৩.৭০%) জন, ৪৬-৬০ বছরের জনসংখ্যা ৩৬ (১৯.৫৭%) জন এবং ৬১ এর উর্ধ্বে সর্বমোট জন সংখ্যা ৪ (২.১৭%) জন।

ফারুক গ্রামে দুই ধরনের পরিবার লক্ষ্য করা গিয়েছে। একক পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। একক পরিবার হচ্ছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের সন্তান সহ বসবাস করে আর বর্ধিত পরিবার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী তাদের বিবাহিত সন্তানাদি এবং তাদের সন্তানাদি সহ একত্রে বসবাস করা। ফারুক গ্রামে ৩৫টি নমুনা খানার উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা অনুসারে পরিবারের আকারের উপর একটি সারণী নিম্নে দেখানো হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ০৮ উত্তর দাতা পরিবারের ধরন ও জনসংখ্যা ঃ

পরিবারের ধরন	খানার সংখ্যা	শতকরা	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শতকরা
একক পরিবার	২৬	৭৪.২৯	১০৪	৫৬.৫২
বর্ধিত পরিবার	০৯	২৫.৭১	৮০	৪৩.৪৮
সর্বমোট	৩৫	১০০	১৮৪	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

ফারুক গ্রামে গবেষিত খানাগুলোর মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। একক পরিবারের ২৬টি (৭৪.২৯%) যার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১০৪ জন (৫৬.৫২%) এবং বর্ধিত পরিবার ৯টি (২৫.৭১%) যার সদস্য সংখ্যা ৮০জন (৪৩.৪৮%)। গবেষনাকৃত ৩৫টি পরিবারের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৮৪জন। উক্ত গড় পরিবার সদস্য ৫.২৬।

ফারুক গ্রামের অধিবাসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ অগ্রসরমান। অধ্যয়নকৃত খানা গুলো হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে তাদের শিক্ষার হার একটি সারণীর মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলঃ

সারণী নং ০৯ লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষিত জনসংখ্যা ঃ

শিক্ষার স্তর	ছাত্র	শতকরা	ছাত্রী	শতকরা	সর্বমোট	মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা
প্রাথমিক স্তর (১ম-৫ম)	৫৫	৬১.৮০	৩৯	৬২.৯০	৯৪	৬২.২৫
মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-১০ম)	২০	২২.৪৭	১৫	২৪.১৯	৩৫	২৩.১৮
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ- দ্বাদশ)	১১	১২.৩৬	০৭	১১.২৯	১৮	১১.৯২
স্নাতক পর্যায়	০৩	৩.৩৭	০১	১.৬১	০৪	২.৬৫
সর্বমোট	৮৯	১০০	৬২	১০০	১৫১	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

৯নং সারণীতে দেখা যায় যে, ফারুক গ্রামে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত ৬২.২৫%, মাধ্যমিক স্তরে ২৩.১৮%, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১১.৯২% এবং স্নাতক পর্যায়ে ২.৬৫%। যা বাংলাদেশের শিক্ষার হারের চেয়ে বেশী। মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার হারটি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। কারন অর্থনৈতিক ও দারিদ্রতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে তাদের শিক্ষাগ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নৃবৈজ্ঞানিক ভাবে বলা যায় যে, বোমদের সকল খানাতে শিক্ষিত জনসংখ্যা রয়েছে।

অধ্যয়নকালে ফারুক গ্রামে বিভিন্ন পেশার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে তা নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল ঃ

সারণী নং ১০ উত্তরদাতার পেশার ধরন ঃ

পেশার ধরন	খানার সংখ্যা	শতকরা	কর্মজীবি লোক	শতকরা
চাকুরী জীবি (সরকারী)	০৫	১৪.২৯	১১	৯.৬৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	০৪	১১.৪৩	০৯	৭.৮৯
জুম চাষ	১৯	৫৪.২৯	৭৬	৬৬.৬৭
দিন মজুর	০৫	১৪.২৯	১১	৯.৬৫
এনজিও	০১	২.৮৫	০২	১.৭৫
অন্যান্য	০১	২.৮৫	০৫	৪.৩৯
সর্বমোট	৩৫	১০০	১১৪	১০০

(মাঠকর্ম ২০১০)

উক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, বোমদের ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারন পেশার বৈচিত্র্যতা থেকে অনুমিত ধারনা করা যায় যে, এরা সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে কর্মরত থাকেন। এর ফলে তাদের সাথে আন্তঃ ও বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপন শুরু হয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা ইদানীংকালে একটি নতুন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে তা হচ্ছে টুরিস্ট গাইডের কাজ করা। বান্দরবানের ফারুক গ্রামে একটি শৈল প্রপাত রয়েছে যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং পর্যটকদের আকর্ষন করে। এখানকার যুবকরা পর্যটকদের সাথে টুরিস্ট গাইডের কাজ করে এবং এই শৈল প্রপাতকে ঘিরে অনেক ছোট দোকানের সৃষ্টি হয়েছে যা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের নতুন পেশার সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। এই গ্রামের বাড়ীঘর গুলো সুবিন্যাস্ত। প্রতিটি বাড়ীর সামনেই সবজি ও ফুলের বাগান লক্ষ্যনীয় যা তাদের সুরুচির পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ ও সামাজিক সংগঠন

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রক হচ্ছে সমাজ। এখানে মানুষ পরস্পর সুশৃঙ্খল বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগীতা। সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালের মধ্য দিয়ে সাধারনত সমাজ গঠিত হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে। সমাজ মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মিটায়। মানব সমাজকে সৃশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হচ্ছে সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। এটি হচ্ছে সমাজের মূল চালিকা শক্তি। এখানে মানুষ বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মৌলিক প্রয়োজন পরিপূরনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব রয়েছে এবং মানুষের সামাজিকীকরন, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বাহক হয়ে এটি টিকে থাকে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায়। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। এটি হল অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ন ক্রিয়াকলাপ, রীতি বা প্রথা যা সামাজিক লোকরীতি ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। "সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজজীবনের সে সব বৈশিষ্ট্য যেগুলো বংশধরদের পর্যায়ক্রমিক আগ্রহ এবং সমাজ জীবনে মারাত্মক পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগের পর যুগ অব্যাহত থাকে। (খান,১৯৭৯,২১৬)

সমাজে মানুষের ব্যবহার ও আচরন নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে এ রীতি বা প্রথাগুলোর উদ্ভব হয় এবং এগুলো ধীরে ধীরে সুসংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। যেমন, পরিবার, বিবাহ ইত্যাদি। এই সামাজিক সংগঠন সমূহের সুনির্দিষ্ট-কার্যক্রম থাকে প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে আন্তঃ সম্পর্ক যুক্ত। বাংলাদেশে বসবাসরত বম নৃগোষ্ঠী স্থানান্তরিত অধিবাসী হলেও তাদের ঐতিহ্যগত সমাজ কতকগুলো সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম দ্বারা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত। যেমন-গোত্র, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, বিবাহ ইত্যাদি। বোম নৃগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের পরিচালিত বর্ণনা করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

গোত্র ভিত্তিক সমাজ

কোন কোন গবেষকের মতে, বোম ও পাংখোয়া একই জাতির অন্তর্ভূক্ত। এদের পারিবারিক, সামাজিক, আচার-আচরণ, ভাষা ও রীতিনীতি একই রকম মনে করা হয়ে থাকে (রউফ পৃ ৮১,২০০৪) তা সত্ত্বেও ঐতিহ্যগত বোমরা কালক্রমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নিজস্ব ভাবধারা নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে নিজেদের আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্র ও উপগোত্র রয়েছে। তেমনি বোমরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এরা প্রধান দুটি গোত্রে বিভক্ত। এগুলোর কতগুলো উপগোত্র রয়েছে। প্রধান দুটো গোত্র হচ্ছে- (১) সুনতলা (২) পাংহয়। সুনতলা হচ্ছে- উচ্চ বংশীয় রাজাদের গোত্র এবং পাংহয় হচ্ছে- নিম্ন বংশীয় গোত্র।

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে প্রধান দুটো গোত্রের উপগোত্র সমূহ দেখানো হল-

সুনতলা গোত্রের উপগোত্র সমূহ	পাংহয় গোত্রের উপগোত্র সমূহ
জা হাউ	সাইলুক
জা থাং	পালাং
চীন জাহ	রাখা
লনচেও	সাতেক
চেওরেক	রোপি
রেংকে	সাখং
সিয়ারলন	তিপি লিং
সান দৌ	সামথাং
তেনু	থাং মিং
বয়তুলং	সাংলা
থিলুন	কমলাও
ভানদির	সাহু
লং সিং	পং কেং
লাইতাক	লেং তেং
লাল নাম	খোয়াল রিং

Dhaka University Institutional Repository

তলুয়াংথাং	সামথিং
মিলাই	রেমপেচে
মারাম	মিত
থাংতো	ইনচিয়া
রোয়াললেং	ফংতয়
খেংলট	চারাং
লেই হাং	মিলু
আই নেহ	সাহু
লাইকে	আমলাই
তৌঙির	থাংথিং
হাউ হেং	বুইতিং
ভয়তলুং	ডেমরং
চেরলাই	নাকো

(আলহ্ জিং, পৃ ১৩৭, ২০০৭।)।

এই গোত্রগুলোর মধ্যে উচু বংশ ও নিচু বংশ রয়েছে। উচু বংশ বলতে বুঝায় রাজ বংশীয় লোকজন। বলা হয়ে থাকে রাজ বংশীয় লোকেরা এতদঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বহু বছর আগে থেকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য থেকে নিজেদের গৃহস্থালী কাজে নিয়োগের জন্য চাকর চাকরানী সংগ্রহ করে ছিলেন। পরবর্তীতে এরা নিজেরাই একটি গোত্রে পরিনত হয়। একটি গোত্র বা অধিক গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পাড়া। একই পাড়ায় এক সঙ্গে উচু ও নিচু বংশীয় লোকেরা বসবাস করে। বোমদের মধ্যে বংশ কিংবা গোত্র নিয়ে কেউ নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে না। তবে অতীতে বোমদের এই উচু ও নিচু গোত্র নিয়ে অনেক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বোমদের সমাজ একটি স্তরায়িত সমাজ। স্তরায়নটি ঐহিত্যগতভাবে বংশ মর্যাদা ভিত্তিতে রয়েছে যা ওয়েবার (চৌধুরী, পৃ ১২, ১৯৮৫) তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমাজ স্তরায়নে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান অধ্যয়ন থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতা, বন্ধুত্বপূর্ন মনোভাব, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং গোত্রের মধ্যে বিভেদহীন অবস্থা বিরাজমান। সুতরাং বোমদের গোত্রীয় জীবনধারা সহজ সরল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার

পরিবার হচ্ছে একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। পরিবার বিশ্বের সকল সমাজেই উপস্থিত। নৃবিজ্ঞানীদের মতে- "পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক দল যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একত্রে বসবাস, অর্থনৈতিক সহযোগীতা এবং পুনরুৎপাদন। পরিবারে থাকে প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষের সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য যৌন সম্পর্ক। এছাড়াও পরিবারে আরও থাকে সন্তান সন্ততি, যারা উক্ত পরিবারের বৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে পরিচিত হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা সমাজে কয়েক ধরনের পরিবারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। যেমন মাতৃতান্ত্রিক পরিবার- যেখানে পরিবারের সদস্যদের পরিচিতি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার মায়ের বংশের ভিত্তিতে মেয়েতে গিয়ে বর্তায়। অর্থাৎ মাতাই পরিবার প্রধান। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার- এক্ষেত্রে পিতা হচ্ছেন পরিবার প্রধান। সন্তানেরা পিতার পরিচয়ে পরিচিত এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিতা হতে পুত্রে বর্তায়। নৃবিজ্ঞানীরা আকারের উপর ভিত্তি করে পরিবারের আরও দুটো রূপের কথা বলেছেন। যেমন- একক পরিবার- স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়। বর্ধিত পরিবার- এ ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানরা, তাদের পিতা-মাতা, ভাইবোন, মাতার পিতা-মাতা, অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিত সন্তানরাও একত্রে বসবাস করে থাকে (রহমান, পৃ ৮৫-৮৭, ১৯৯৫)।

বোম সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই হচ্ছে পরিবার প্রধান। পিতার পরিচয়ে সন্তানদের পরিচয় নির্ধারিত হয় এবং উত্তরাধিকারও পিতা হতে পুত্রে বর্তায়। বোম সমাজের অধিকাংশ পরিবার ছিল বর্ধিত আকারের পরিবার। কারণ পূর্বে তাদের অর্থনীতি ছিল শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক এবং জুম চাষ ভিত্তিক। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার ও পেশার বৈচিত্র্যতার ফলে বর্ধিত পরিবারগুলো ক্রমেই একক পরিবারে পরিবর্তিত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিশ্বায়ন, নগরায়ন এবং শিল্পায়নের ফলে বম নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা তথা পরিবার কাঠামো শিথিল হচ্ছে যার ফলে তাদের সহজ সরল জীবনধারাটি জটিলতার আবর্তে আবর্তিত এবং আধুনিকতার সংস্পর্শে লালিত হতে শুরু করেছে।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থা

বোম নৃগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের আওতাভূক্ত। সকল সদস্যরাই পিতাকে পরিবার প্রধান হিসেবে মেনে চলে। পিতাই পারিবারিক সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। যদিও বোম মেয়েরা পরিবারে অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখে তথাপি তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে পারিবারিক তেমন কোন কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। বোম পরিবারে মহিলারা সম্পূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

কঠোরভাবে উত্তরাধিকারের পারিবারিক আইন মেনে চলে। যদিও অধিকাংশ সমাজে উত্তরাধিকার আইন মহিলাদের বিপরীতে যায়। বোম সমাজে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আইন মেনে চলা হয়ঃ

- বিধবা নারীরা মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেনা।
- পিতার সম্পত্তি সরাসরি পুত্রে বর্তাবে।
- কন্যা সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেনা।
- যখন পুত্র সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন হবে তখন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র সন্তান সবচেয়ে বেশী সম্পত্তি পাবে।
- যদি পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সম্পত্তি গ্রহন করতে পারবে। (সুনেন্দু, পৃ ৫৩, ২০০৬)

উক্ত আইন বম সমাজের চাষযোগ্যভূমি, বসতবাড়ী, সব্জিবাগান ইত্যাদি হস্তান্তর অযোগ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হস্তান্তর যোগ্য সম্পত্তি যেমন গহনা, ট্রাংক, যন্ত্রপাতি, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে সকলেই ভোগ করে থাকে। (প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩, ২০০৬)

জ্ঞাতি সম্পর্ক

নৃবিজ্ঞানীদের মতে জ্ঞাতিসম্পর্ক হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের ও সামাজিক বন্ধনের মূল ভিত্তি। পৃথিবীর সকল সমাজ তা উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত, অথবা বন্য, বর্বর ও সভ্য যাই হোক না কেন জ্ঞাতি বন্ধনই সংগঠিত করে সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখে। জ্ঞাতিত্বের মূলে রয়েছে মানুষের প্রজনন যা জৈবিক ও প্রাকৃতিক বিষয়। প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতি হিসাবে মানুষের টিকে থাকা যেমন নিশ্চিত হয় ঠিক একই ভাবে জ্ঞাতি বন্ধনের সাহায্যে সমাজের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়। জ্ঞাতিত্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক সত্যের সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক নির্মান। এ অর্থে জ্ঞাতিত্ব একই সাথে প্রাকৃতিক, জৈবিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। জ্ঞাতিত্ব সমাজের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে অর্থাৎ কারা রক্তসূত্রে জ্ঞাতি বন্ধনে আবদ্ধ ও কারা জ্ঞাতিকুল নয়। আর এই বিভাজনের ভিত্তি হচ্ছে জন্মদান সংক্রান্ত প্রাকৃতিক বিষয়াবলী যা অপরবর্তনীয় এবং বিশ্বজনীন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজের সামাজিক সংগঠনকে বুঝতে হলে অবশ্যই উক্ত সমাজের জ্ঞাতিসম্পর্কের আলোকে বুঝতে হবে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে এই ধরনের জ্ঞাতি সম্পর্ক সাধারণত বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা, রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক আত্মীয়তা এবং কাল্পনিক সূত্রে হয়ে থাকে। বম সমাজেও একই রকম জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

মত বম সমাজেও জ্ঞাতিসম্পর্ক গুলোকে চিহ্নিত করার জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদাবলীও রয়েছে, যা মর্গান বর্ণিত জ্ঞাতিসম্পর্ককে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গান তাঁর Ancient Society (1877) গ্রন্থে দুই ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্কিত পদাবলীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞাতি সম্পর্কিত পদাবলী দুই ধরনের হয়ে থাকে, ১। শ্রেণীমূলক জ্ঞাতিব্যবস্থা - এই ব্যবস্থায় একই প্রজন্মের সকল পুরুষকে একটি পদ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং একই ভাবে একই প্রজন্মের সকল মহিলাকে একই পদ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি বিশেষ পিতা, পিতার ভাই, এমনকি দুরসম্পর্কিত পিতার আত্মীয় স্বজন সকল পুরুষরাই পিতা হিসাবে চিহ্নিত হবে। এ পদ্ধতিটি মায়ের দিকের মহিলা আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। ২। বর্ননামূলক জ্ঞাতি ব্যবস্থা - এ জ্ঞাতি ব্যবস্থা অনুসারে সকল সামাজিক সর্ম্পক গুলো সনাক্তকরনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন- চাচা,বাবা, মামা, ইত্যাদি । এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার চাচা ও মামার আচরণে পিতার আচরন প্রত্যাশা করে না। মর্গান বর্ণিত জ্ঞাতিসম্পর্কিত পদাবলী অনুসারে গবেষিত বম নৃগোষ্ঠীতে বর্ণনামূলক জ্ঞাতিসম্পর্কিত পদাবলীর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। কারণ বোম সমাজে সকল সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়নে যে সকল জ্ঞাতি সম্পর্কিত পদাবলী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেখানো হলঃ

জ্ঞাতিসম্পর্কের নাম	বোম সমাজের ব্যবহৃত পদাবলী
বাবা	পা (Pa)
মা	ন্যু (Nu)
স্বামী	পাছাল (Pasal)
স্ত্রী	নুপি (Nupi)
ভাই	টা (Ta)
বড় বোন	ওঁ (o)
ছোট বোন	ন্যঁও (Naw)
বাবার ভাইয়ের ছেলে	ওঁ (o)
বাবার ভাইয়ের মেয়ে	ওঁ (o)
মাতার ভাইয়ের ছেলে	ওঁ (o)

Dhaka University Institutional Repository

মাতার ভাইয়ের মেয়ে	ওঁ (o)
মাতার বোনের ছেলে	ওঁ (o)
মাতার বোনের মেয়ে	ওঁ (o)
বাবার বোনের ছেলে	ওঁ (o)
বাবার বোনের মেয়ে	ওঁ (o)
বাবার বোনের স্বামী	ট্যাং (Tang)
বাবার ভাইয়ের স্ত্রী	ন্যুট (Nute)
ভাইয়ের স্ত্রী	ওঁ (o)
বড় ভাইয়ের স্ত্রী	ন্যুও (Naw)
বোনের স্বামী	ওঁ (o)
বড় বোনের স্বামী	ন্যুও (Naw)
স্ত্রীর ভাই	ওঁ (o)
স্ত্রীর ভাইয়ের স্ত্রী	ওঁ (o)
স্ত্রীর বোনের স্বামী	ওঁ (o)
বাবার ভাই	পেট (Pate)
বাবার বোন	নাই (Ni)
মাতার ভাই	পু (Pu)
মাতার বোন	নুপি (Nupi)
বাবার বাবা	পু (Pu)
মাতার বাবা	পু (Pu)
বাবার মাতা	পি (Pi)
মাতার মাতা	পি (Pi)
মায়ের বোনের স্বামী	পেইট (Pate)
মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী	পি (Pi)

সূত্রঃ মাঠকর্ম ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

এই পদাবলীগুলো দ্বারা বোম সমাজের আত্মীয়তার সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করা হয়। তবে বর্তমানে বোম সমাজের পরিবারগুলোতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাব, পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারের জন্য শহরমুখী হওয়ায় তাদের জ্ঞাতি সম্পর্কিত পদাবলীতেও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন বৃহত্তর সমাজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অন্যান্য নৃগোষ্ঠী গুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ দিক থেকে বোমরা ব্যতিক্রম নয়। আজকাল বোমরা খালা ও খালুকে ইংরেজি পদাবলী আন্টি ও আংকেল বলে সম্বোধন করে থাকে।

বিবাহ ব্যবস্থা

বিবাহ হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ ব্যতিত পরিবার গঠন সম্ভবপর নয়। বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী ও একজন পুরুষের যৌন সম্পর্ককে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং এই যৌন সম্পর্কের ফলে ভূমিষ্ঠ সন্তান বৈধ সন্তান হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। সকল সমাজেই বিবাহের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ একমাত্র বিবাহই সমাজকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নৃবিজ্ঞানীরা সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের কথা বলেছেন। যেমন- ১। একপত্নী বিবাহ- এটি বিবাহের এমন একটি ধরন যেখানে একজন পুরুষের সাথে একজন মহিলার বিবাহ সংগঠিত হয়। প্রাচীন সমাজ হতে শুরু করে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত এটি সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় বিবাহ পদ্ধতি। ২। বহু বিবাহ- এই ক্ষেত্রে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। অর্থাৎ একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। আবার অন্যরূপও রয়েছে যেমন- একজন স্ত্রী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে, সাধারণত এ ধরনের বিবাহ রীতি বর্তমান সমাজে একেবারেই দেখা যায় না। ৩। অন্তঃবিবাহ- যখন কোন ব্যক্তিকে নিজ সমাজ কিংবা গোত্র হতে পাত্রী নির্বাচন করে বিবাহ সংঘটিত করতে হয় তখন তাকে অন্তঃবিবাহ বলে। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। ৪। বহিঃগোত্র বিবাহ- যখন স্বগোত্রে পাত্রপাত্রী নির্বাচন ও বিয়ে নিষিদ্ধ থাকে তখন তাকে বহিঃগোত্র বিবাহ বলে। ৫। লেভিরেট - যখন কোন বিধবা মহিলা মৃত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে লেভিরেট বলে। ৬। সরোরেট- যখন কোন ব্যক্তি মৃত স্ত্রীর বোনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে সরোরেট বিবাহ বলে (রহমান, পৃ-২৯০-২৯১, ১৯৮৮)। উপরোক্ত বিবাহ পদ্ধতিগুলোই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত রয়েছে। বোম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। সাধারণত বোম সমাজে একপত্নী বিবাহ ও বহিগোত্র বিবাহ সর্বাধিক প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি। তবে সীমিত ক্ষেত্রে অন্তর্গোত্র বিবাহকেও উৎসাহিত করা হয়। অতীতে বোম সমাজের প্রধান দুই গোত্র সুনতলা ও পাংহয় গোত্রের মধ্যে সুনতলা গোত্রে অন্তর্বিবাহ রীতি প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল এবং পাংহয় গোত্রে অন্তর্বিবাহ ও বহিঃবিবাহ উভয় রীতিই প্রচলিত ছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা বিস্তারের ফলে বোম সমাজের বিবাহেও পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে উভয় গোত্রেই বহিঃবিবাহ রীতি প্রচলিত রয়েছে। এছাড়াও পুনরায় বিবাহ পদ্ধতিও লক্ষ্যনীয়। যেমন- কোন ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলে সে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। অথবা কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সেও পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। বোম সমাজে বিবাহ সংগঠিত হওয়ার দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- (১) প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক ভিত্তিক বিবাহ (২) আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ প্রক্রিয়া।

প্রেমের বিবাহ

এই প্রক্রিয়ায় যুবক যুবতীরা পরস্পরের সহিত প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে বিবাহ সংগঠিত করে থাকে। এ প্রক্রিয়া পিতা-মাতা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বিবাহ সংগঠিত হয়ে থাকে। তবে পরবর্তীতে পিতা-মাতার সহিত সর্ম্পক পুনঃস্থাপন হয়।

আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ

এটি বোম সমাজের সর্বস্বীকৃত ও জনপ্রিয় বিবাহ পদ্ধতি। এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। তা হচ্ছে বোম সমাজে সন্তানদের বিয়ে দেয়া এবং করানো বাবা মায়ের দায়িত্ব। কারও ছেলের বিয়ের বয়স হলে সে প্রত্যক্ষভাবে তার বাবা মাকে না জানালেও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যজনের মাধ্যমে তার বাবা মাকে জানায়। তবে মা বাবা এবং অভিভাবকের মাধ্যমে ঠিক করা বিয়েতেও ছেলে-মেয়েদের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফুপাত অথবা মামাতো বোনকে বিয়ে করলে বম যুবক সমাজে প্রশংসিত হয়। বোম সমাজে বিবাহের বয়স কালের কোন সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। বয়োজেষ্ঠের আগে বয়োকনিষ্ঠের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। বিয়ের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে দৈহিক সৌন্দর্য, দারিদ্র অথবা ধন সম্পদের দিকে খেয়াল করা হয় না। বম ভাষায় 'জুংথিয়া মনি' মানে শৈল্পিক গুনের অধিকারী কিনা সে বিষয়ে খেয়াল করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়। পাত্রী নির্বাচনের প্রথম অবস্থাকে বম ভাষায় বলে 'হেলহ' । পাত্র তার বন্ধুদের সহায়তায় পাত্রীর বাড়ী গিয়ে পাত্রীর সাথে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে পাত্র নিজেই মেয়ের কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে। এভাবে পর পর তিনবার প্রেম নিবেদন করার পর মেয়েটি রাজী হলে দু'জনে মিলে তাদের বৈবাহিক জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টি অভিভাবককে অবহিত করে তারপর পর্যায়ক্রমে কনের বাড়ীতে রেল পালাই (একের অধিক ঘটক নিযুক্ত করা) এবং রেলআন (ঘটক খাওয়ানো), মাণ (পণ) নির্ণয় করা এবং বিবাহের দিন স্থির করা ইত্যাদি পর্ব শেষ হওয়ার পর

Dhaka University Institutional Repository

উভয় পক্ষের অভিভাবকের মধ্যে যাবতীয় পণ নিয়ে মৌখিকভাবে চুক্তি অথবা শর্ত সম্পাদন করা হয় । এদের ভাষায় এটিকে বলা হয় 'ইনকাইসিয়াহ্' । ঘটকালীর দিন হিসেবে বুধবার শুভ হিসেবে বিবেচিত হয় (রউফ, পৃ ৮৫, ২০০৪)।

বোম সমাজে কনেপণ প্রথা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পণের প্রাধান্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় । বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সমস্ত পণ একসঙ্গে কনে পক্ষকে দিয়ে আসতে হয়। কনের জন্য বর পক্ষ থেকে পাওয়া সমুদয় পণ সামগ্রী কনের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। যেমনঃ রোয়াংমান, নোমান, পোমান, পামান, টামান, টাঠুয়াত, নিমান, আরত্মেইহ, মানপিয়া ইত্যাদি হল কনের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এবং ঘটকদের মাঝে নিয়ম অনুযায়ী এবং প্রথানুযায়ী কনের জন্য পাওয়া পণ সমূহ ভাগ করার নাম (রউফ, পৃ ৮৫, ২০০৪)। নানা রকম নিয়ম কানুন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে কনে নিয়ে বর পক্ষ বাড়ীতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে বরের বন্ধুরা গুলি ছুড়ে নববধুর আগমন বার্তা জানায় । তখন সম্পূর্ণ গ্রামের সবাই আনন্দে মেতে উঠে। তারপর পানাহার আর বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে বধূবরন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে বোম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষীত হওয়াতে এ ধর্মমতে পাত্রপাত্রী আত্মীয়স্বজন সহ গীর্জায় গিয়ে আংটি বদলের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা করা হয়না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি পাত্র পাত্রীরা অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছল থাকে তাহলে তারা বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোতে বর বধূ উভয়ের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধ বান্ধবরা অংশ গ্রহন করে থাকে।

আবাসগৃহ

বান্দরবানের যে এলাকা সমূহে বোম নৃগোষ্ঠী বসবাস করে সেগুলো অধিকাংশই পাহাড়ী এলাকা। তারা সাধারণত যে কোন পাহাড়ের চুড়ায় বসবাস করতে পছন্দ করে, সাধারনত এর উচ্চতা ভূমি থেকে যে কোন পাহাড়ের মাঝারী অবস্থান হতে সর্বোচ্চ চূড়া পযর্ন্ত হয়ে থাকে।পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসরত বোমদের ঘরবাড়ী গুলো হচ্ছে দু'চালা বিশিষ্ট। এগুলোকে মাচাং ঘর (ছঁবি নং-১) বলা হয় । বন্য ও হিংস্র জীবজন্তু হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মাচাং ঘর তৈরী করা হয়। এছাড়া সাইক্লোন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা আলাদাভাবে সাইক্লোন শেল্টার (আবরন) তৈরী করে। এই শেলটারকে বোম ভাষায় "থিলইন তে" বলা হয়। অতীতে বোমরা ঘরের চাল কুমুর পাতা দিয়ে আবৃত করত । এরপরে এক সময় তারা বাঁশের

Dhaka University Institutional Repository

পাতা দিয়ে ঘরের চাল আবৃত করত এবং পরবর্তী সময়ে ছন দিয়ে আবৃত করে। তবে বর্তমানে টিন দিয়ে আবৃত করা ঘরও বোম পাড়ায় দেখা যায়। বোমরা পাহাড়ের গাছ, বাঁশ, বেত, ছন প্রভৃতির উপকরন দ্বারা মাচাং ঘর তৈরী করে। মাচাং ঘরকে বোম ভাষায় 'ইনচুংচয়' বলে থাকে। ঘরের নিচে গৃহপালিত শুকর, ছাগল, গরু প্রভৃতি রাখা হয়। মাচাং ঘরের নিচের অংশ বাঁশ দিয়ে বেড়া দেয়া হয়। বোমদের ঘরের আকৃতি তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়। যে সকল পরিবারে যুবক থাকে তা হলে মূল ঘরের সাথে সংযোগ রেখে আলাদাভাবে ছোট আরেকটি ঘর তৈরী করা হয়। এই তৈরী ঘরে পাড়ার যুবকেরা মাঝে মধ্যে এসে রাত্রিযাপন করে। পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মূল ঘর সংলগ্ন আরও ঘর বৃদ্ধি করলে তাকে 'বাংআনলাক' ঘর বলে। বোমদের ঐতিহ্যবাহী ঘরের সামনের বেড়ায় ঘরের মালিক কর্তৃক শিকারে প্রাপ্ত বন্য ও হিংস্র জন্তুর মাথার খুলি, ভীমরাজ পাখির লেজ, হরিণের মাথার খুলি প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে যা অন্যদের আকৃষ্ট করে (ছঁবি নং-২)। সাধারনত বাসগৃহ এবং ঘরের ছাউনি দেখে মালিকদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। বোমরা আদিকাল থেকে জুমচাষী হিসেবে ৫০ পরিবার থেকে ১০০ পরিবার পর্যন্ত একত্রে বসবাস করে আসছে। বোমরা বাসগৃহকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে। প্রথমতঃ আর-ইন-এটি হচ্ছে মুরগীর ঘর। এটি মূল ঘরের সাথে সংযুক্ত থাকে। মূল ঘরের উঠার সিড়ির বাম পাশে মুরগীর ঘরটি তৈরী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ তি-শুয়ারইন-এটি পানি রাখার ঘর। এটির মুরগীর ঘরের সাথে সংযোগ রয়েছে। 'মুরগীঘর' ঘরের বাইরের অংশ। কিন্তু 'পানিরাখারঘর' ঘরের ভিতরে থাকে। পানি রাখার জন্য শুধু লাউয়ের খোল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে প্লাস্টিকের গ্যালন এবং এ্যালুমিনিয়াম এর কলসও ব্যবহার হচ্ছে। এবং তৃতীয়তঃ রেনঠাং-এটি হচ্ছে খোলা বারান্দা। বোমরা মূল বাসগৃহের সাথে সংযোগ রেখে একটি খোলা বারান্দা তৈরী করে। ঘরের সদস্যরা খোলা বারান্দায় সন্ধ্যাকালে খাওয়া দাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। এছাড়া অন্যান্য কাজেও তা ব্যবহার করা হয়।

বোমরা মাচাং ঘরের সিড়ি কাঠ দিয়ে তৈরী করে। ঘরের সিড়ির পরে প্রথম বেড়ায় বন্য প্রানীর মাথার খুলি দিয়ে সাজানো থাকে। প্রথম বেড়া ও দ্বিতীয় বেড়ার মাঝখানে 'সুমতৌ' (বসার জন্য জায়গা) রেখে তার পাশাপাশি গৃহপালিত শুকর গুলোকে খাবার দেয়ার জন্য ছিদ্র রাখে। বর্ষার দিনেও মাটিতে অর্থাৎ নিচে মাটিতে নামার প্রয়োজন হয় না, সেখান থেকেই ঘরের চালা পরিস্কার করতে পারে। খোলা বারান্দায় বর্ষার দিনে বৃষ্টির পানি জমা করে এজন্য বৃষ্টির দিনে পানি তুলতে হয় না। আসল ঘরের ভিতর লম্বা-

Dhaka University Institutional Repository

লম্বিভাবে বেড়া দিয়ে থাকে অর্থাৎ মূল ঘরটিকে দুটি কক্ষে বিভক্ত করে । ধানের গোলা পরিবারের কর্তার কক্ষে রাখা হয় এবং তেমনিভাবে ঘরের চুলাও কর্তার কক্ষের পাশে রাখা হয়। বোমরা অতিথিদের রাখার জন্য বিশেষ একটি ঘর তৈরী করে। অতিথিদের কক্ষগুলো খোলা জানালা, বড় দরজা অর্থাৎ ঘরের বারান্দা সংযুক্ত দরজাটি বড় রাখে। ফলে ঘরটি আলোকিত থাকে। বমদের বাসগৃহগুলো অনেক ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটে (আলহ্, পৃ ১৪২, ২০০৭)।

বর্তমানে শিক্ষা কিংবা চাকুরীর প্রয়োজনে অনেক বোম পরিবার শহরে বসবাস করছে। এক্ষেত্রে বসবাসরত পরিবার গুলোর বাসগৃহ গুলো নিজস্ব ঐতিহ্য সম্বলিত হয় না । বরং তারা বাঙ্গালীদের বাড়ীগুলোতে ভাড়া থাকে। তাদের ঘরের আসবাব পত্রগুলোও আধুনিক থাকে। যেমন-তাদের ঘরগুলোতে কাঠের আধুনিক নকশা সম্বলিত পালঙ্ক সোফাসেট, আলমারী, সিন্দুক, টেলিভিশন ইত্যাদি আসবাবপত্র থাকে। এছাড়া বর্তমানে মুঠো ফোনের মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ আরও সহজতর। বাসাবাড়ীগুলোতে মুঠোফোন, কম্পিউটারের মত আধুনিক জিনিসপত্র ও লক্ষ্য করা যায়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

জড়োউপাসক বোম জনগোষ্ঠী রোগব্যাধি জরা দূরীকরনে পূজা, ব্রত-অনুষ্ঠান, যাদুমন্ত্র, পানি পড়া, তেলপড়া ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস রয়েছে। উল্লেখ্য প্রত্যেকটি রোগ ব্যাধির অন্তরালে অপদেবতা নিয়োজিত আছে বলে তারা বিশ্বাস করে। রোগ ব্যাধির কারন সম্পর্কে অধ্যয়নরত গৃহস্থালীর বিশ্বাস অধিক ভয় এবং পাপ জনিত ব্যাপার থেকে আত্মার সাময়িক অনুপস্থিতি ঘটে। পাপ থেকে ভয়ের উৎপত্তি এবং পাপ থাকলে যে কোন প্রকারে ভয় পাবেই এবং রোগাক্রান্ত হবেই। তাই পাপই রোগের আসল কারন । পাপ থেকে বিরত থাকলে রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারনত চিকিৎসার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুদ্ধিকরন অনুষ্ঠান পালন অবশ্য কর্তব্য। এই ধরনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় বৈদ্যরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসলের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ করেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিস্কারের পাশাপাশি বমরা গাছ-গাছড়ার রস মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা করে। রোগীর কোন অসুখ তা ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ এ ধরনের ব্যক্তিরাই নির্ধারন করেন । অবশ্য বর্তমানে বোমরা বনজ চিকিৎসার পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা গ্রহন করে থাকে।

আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনে তারা বান্দরবান সদর হাসপাতালে আসে। এছাড়া রুমা উপজেলায় একটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। বোম সমাজের ছেলে মেয়েরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন। বোম

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে তাদের চার্চের মাধ্যমে কিছু ছেলে মেয়েকে প্রশিক্ষণ করানো হয় যারা পরবর্তীতে পাহাড়ের দুর্গম পাড়াগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা করে। এছাড়া তাদের মধ্যে যে কোন অসুস্থতার ব্যাপারে তারা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর সহায়তা নিয়ে থাকে।

শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত বৃহত্তম এই বান্দরবান জেলায় শিক্ষার হার সর্বনিম্ন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত বোমদের একটি সাময়িকীতে তাদের শিক্ষার হার ছিল মাত্র ১৯% (Loncheu, P 3, 2003)। বর্তমানে বান্দরবান জেলায় সর্বমোট ৪টি মহাবিদ্যালয় (সরকারী ১টি), ৩০টি উচ্চ বিদ্যালয় (সরকারী ৫টি) ৩০টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ১টি সুইডিশ বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, ৫০টি ফোরকানিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ১৮টি পালি টোল ও একটি পি.টি.আই ট্রেনিং স্কুল রয়েছে। ১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীদের মত বোমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তবে বোমদের নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন-বোম অধ্যুষিত লাইমি পাড়ায় রয়েছে জুনিয়র হাইস্কুল, ফারুক পাড়ায় রয়েছে আধা সরকারী প্রাইমারী স্কুল, শেরন পাড়ায় প্রাইমারী স্কুল। এছাড়া রুমা উপজেলায় একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রুমা বাজার হতে কেউক্রাডং যাওয়ার পথে বোম অধ্যুষিত বেথেল পাড়া, মুনলাই পাড়া, সুন্সং পাড়ায় একটি করে সরকারী জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৮০% বোম ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাড়ায় ১টি করে গীর্জা রয়েছে। এগুলোতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। বোমরা ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বোমদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্র মিশনারীদের সহায়তায় বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ করছে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বোমরা অগ্রসরমান। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে। এছাড়া বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ যেমন-নার্সিং, ধাত্রী বিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ সরকার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সমূহে বোমরা শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, ফলে ক্রমান্বয়ে এ নৃগোষ্ঠীটি বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় পরিবর্তনের ধারাটিকে ত্বরান্বিত করছে। বর্তমানে বোমদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তারা মনে করেন যদি বোম গ্রাম গুলোর যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয় এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে সরকারী শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্টান স্থাপিত হয় তাহলে বোমরা আরও শিক্ষিত হতে পারবে যা তাদের অনগ্রসরতা বিমোচনের সহায়ক হবে এবং বৈচিত্র্যময় পেশায় অংশগ্রহন করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।

ভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীগুলো মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীভূক্ত এবং এদের সামাজিক আচার আচরণ, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আকৃতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান হলেও তাদের ভাষাগত পার্থক্য রয়েছে। বোমদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাদের ভাষা তিব্বতী বর্মন ভাষাভূক্ত কুকী চীন শ্রেণীর 'মধ্য কুকীচীন' উপদল ভূক্ত ভাষা। বোমদের ভাষার নাম "CHIN; BAWM"। রোমান বর্ণমালাকে তারা নিজেদের মত করে ব্যবহার করে। বিশেষতঃ মিজোরামে ব্যবহৃত রোমান বর্ণমালাকে তারা নিজেদের বর্নমালা হিসেবে ব্যবহার করে। বোমরা বর্তমানে ২৫টি রোমান হরফ ব্যবহার করে।

বোম ভাষায় ব্যবহৃত হরফগুলো হচ্ছে-

A(a), AW(aw), B(b), CH(ch), D(d), E(e), F(f), G(g), NG(g), H(h), I(i), J(j), K(k), L(l), M(m), N(n), O(o), P(p), R(r), S(s), T(t), U(u), V(v), Z(z).
(মাঠকর্ম)

বোম ভাষায় লিখিত ক্যালেন্ডারও রয়েছে। বোম ভাষায় বার মাসের নাম হচ্ছে-

Lamtuah	-	January	Lam	-	February
Vau	-	March	Phur	-	April
Do	-	May	Tiner	-	June
Zinglem	-	July	Lamlai	-	August
Thlaram	-	September	Phalpi	-	October
Phalte	-	November	Kut	-	December

(মাঠকর্ম)

Dhaka University Institutional Repository

বোম ভাষায় সাত বারের নাম হচ্ছে-

Pathian Ni	Sunday
Tuandawmh Ni	Monday
Tuannawlh Ni	Tuesday
Nili Ni	Wednesday
Ninga Ni	Thursday
Laimi Ni	Friday
Ralring Ni	Saturday

(মাঠকর্ম)

বোম ভাষায় সংখ্যা বাচক শব্দের তালিকা নিম্নরূপঃ

Pknat	এক
Pini	দুই
Pthun	তিন
Plaee	চার
Panga	পাঁচ
Pruk	ছয়
Psri	সাত
Prait	আট
Pok ua	নয়
Pra	দশ

(মাঠকর্ম)

বোমরা নিজের ভাষায় তাদের আভ্যন্তরীন চিঠিপত্র আদান প্রদান করে। বোম ভাষার ব্যবহার বাংলাদেশের বোম সমাজ ছাড়াও ভারতের মিজোরামের কিছু অংশ এবং চীন হিলসের বেশির ভাগ লোকের মধ্যে প্রচলিত। তবে বাংলাদেশের পাংখোয়া, খুমি, খিয়াং, মুরং ও লুসাইদের ভাষার সঙ্গে বোম ভাষার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বোম জনগোষ্ঠীর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নাথান বোম দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করেন, এদের নিজস্ব বর্নমালায় লেখা গানের বই, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং পত্র পত্রিকা রয়েছে যা তাদের সমাজের প্রায় ৮০% জনগোষ্ঠী পড়তে এবং নিজস্ব বর্ণমালায় লিখতে পারে (রউফ, পৃ ৮২, ২০০৪)। বোমভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে উন্নত করার জন্য ২০০৪ সালে Bawm Literature Forum প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও বোম ভাষায় প্রচলিত কাহিনী, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সংগীত ইত্যাদি সকল কিছুকে উন্নত ও বর্ধিত করার জন্য এই সংস্থা কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

খাদ্যাভ্যাস

বোমরা স্বউৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে। ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। দিনে তারা সকালের নাস্ত াসহ তিনবার ভাত খেয়ে থাকে। পাহাড়ি অঞ্চলে মাছের স্বল্পতার কারণে পরিমাণমত মাছ তারা খেতে পাননা। বোমরা শাক-সব্জি তেমন খায়না। শুটকি মাছ খেতে অভ্যস্ত। পাহাড়ী ঝরনার ফলে সৃষ্ট জলাধার যাকে তারা ঝিরি বলে তা থেকে বোমরা নানান জাতীয় মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি এনে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করে। প্রাচীনকাল হতে বোম শিকারী জাতি। তারা বন্য জীবজন্তুর মাংস বেশি খেয়ে থাকেন। বোমরা মাংস আগুনে ছেক দিয়ে শুকায় এবং শুকনা মাংস রান্না করে খায়। শুকনা মাংস দীর্ঘদিন রাখা যায়। তাই বোমরা শুকনা মাংস বেশি পছন্দ করে। কাঁচা মাংস যখন পাওয়া যায়না তখন তারা এই শুকনা মাংস রান্না করে খায়। নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা মাছ থেকে এক ধরনের খাদ্য 'নাপ্পি' তৈরী করেন। বোমরা তরকারি সুস্বাদু করতে 'দামথু' বা নাপ্পি ব্যবহার করে। বিভিন্ন প্রকার মাংসের মধ্যে বমরা গুইসাপ, ব্যাঙ, কাঠবিড়ালী, শামুক, কবুতর বিভিন্ন জাতের পাখি, বিভিন্ন গৃহপালিত জীবজন্তু যেমন- গরু, ছাগল, শুকর এর মাংস খায়। এছাড়া তারা বাঘ, হরিণ, ভাল্লুক ইত্যাদিও শিকার করে। তারা বড় বড় জীবজন্তুর মাংসগুলো চুলার আগুনে শুকিয়ে রাখে এবং দীর্ঘ মেয়াদী খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে। আবার বোমরা কাবাব বানিয়েও মাংস খায়। এরা চর্বি জাতীয় খাবার কম খান। বোমরা বিভিন্ন রকম ফলমূলের মধ্যে আনারস, আম, কলা, পেপে, পেয়ারা, কুল ইত্যাদি ফলমুল খায়। বোমদের আরও একটি সুস্বাদু খাবার হচ্ছে বাঁশ কোড়ল। পাহাড়ে কোন সময় খাদ্যাভাব দেখা দিলে বোমরা ভাতের বিকল্প হিসেবে এ খাদ্য খান। বাঁশ কোড়লকে শুধু সিদ্ধ করে খাওয়া যায় এবং চুলায় কিংবা রৌদ্রে শুকিয়ে শুকনা অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। শুকনা বাঁশ কোড়লকে তারা সব্জি হিসেবে ব্যবহার করে। জংলি তাল গাছের কচি শাস, বেতের কচি শাস, জংলি কলা গাছের থোড় ও মোচা তাদের জনপ্রিয় খাদ্য। আগে কলা পাতায় বেধে শাক সবজি আগুনে সিদ্ধ করে তৈরী খাবারই তাদের পছন্দ ছিল। কেউ কেউ

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশের চোঙায় রান্না করতেন। বোমরা মৃৎ পাত্রে রান্না করতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তবে বর্তমানে এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করে। বোমরা ভাত দিয়ে এক বিশেষ প্রকার মদ তৈরী করে। পাহাড়ে বসবাসরত বোমরা প্রায় সকল সময়ই এ পানীয় গ্রহণ করে থাকে। তারা বিড়ি, সিগারেট, তামাক, পান, হুক্কা ইত্যাদিও গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে শহরবাসী বোমদের খাদ্যাভ্যাসে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের পাশাপাশি পিঠা, পায়েস, শরবত, জুস, কেক, চা, কফি ইত্যাদি পানীয়ও গ্রহণ করে থাকে।

পোশাক পরিচ্ছদ

বোম নৃগোষ্ঠীরা ঐতিহ্যগতভাবে জঙ্গলে বিচরনকারী হিসাবে পরিচিত। তাই তাদের পোশাক পরিচ্ছদেও এর কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে বোমরা শিকার করা বন্য পশুর চামড়া দিয়ে নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরী করত এবং এই ধরনের পোশাক পরিধান করেই তারা শিকার করতো এবং যুদ্ধে যেত। পরবর্তীতে তাদের পোশাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে। তারা নিজস্ব তাঁত বসিয়ে তাদের পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করা শুরু করে। বোমদের পোশাক খুব সাদাসিধে। তাদের নিজস্ব তাঁতকে কোমর তাঁত বলে। বোম মেয়েরা শার্টের মত একটি বস্ত্র পরিধান করে যাকে বোম ভাষায় বলে "করচাই" আর বুকে বাধে এক টুকরা কাপড়। এছাড়া নকশাযুক্ত মোটা কাপড়ের তৈরী শরীরের নিম্নাংশের কাপড় বোম মহিলারা কোমর হতে হাঁটু পর্যন্ত পরিধান করে। একে তারা বলে 'নুফান'। নুফান এর দুই ধারে লম্বালম্বিভাবে ছোট ছোট পুঁথি লাগানো থাকে। রৌপ্য ও ধাতুর তৈরী কোমর বন্ধনী দিয়ে 'নুফান' কোমরে আটকানো থাকে। নুফান সাধারণত দুরকমের হয়ে থাকে যথা- ফেনপেল ও ফেনপোম। ফেনপেল পরার জন্য নানান ধরনের কোমর বিছা ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে রাংখাতে, রাংখাপি, রিচিকে, তাংকরী, তাইপিয়ার ইত্যাদি কোমর বিছা উল্লেখযোগ্য। ফেনপোম ও নুফান ইংলিশ স্কার্ট এর ন্যায় সেলাই করা। এটি কাপড় পেচিয়ে সেলাই করা হয় বলে পরিধানের সময় কোমর বেল্ট এর তেমন প্রয়োজন হয়না। নুফান তৈরীতে বিভিন্ন রকম নকশা ব্যবহার করা হয়। বম পুরুষদের পোশাকও সাধারণ। তারা কোমর তাঁতে তৈরী লাইকর ও রেনতাক পরিধান করে। এগুলো এক বিশেষ ধরনের লুঙ্গি ও শার্টের মত। বর্তমানে বোম পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদেও পরিবর্তন এসেছে। বোম মহিলারা করচাই ও নুফান এর পাশাপাশি বাঙালীদের মত সালোয়ার কামিজ, শাড়ী পরিধান করে। বোম ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের ড্রেস পরিধান করে। বোম পুরুষরা বর্তমানে লুঙ্গি শার্টের পাশাপাশি শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে।

Dhaka University Institutional Repository

বোম রমনীরা অলংকার প্রিয়। তারা নানা ধরনের অলংকার পরে নিজেদের সুন্দরভাবে সাজাতে পছন্দ করে। তাদের অলংকারগুলি সাধারণত রূপা, লোহা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর বা পুথির দ্বারা তৈরী। বোম রমনীরা প্রাচীনকালে গলায় বিভিন্ন ধরনের পুঁতির মালা পড়তো। এগুলো সাধারণত লাল, নীল, সবুজ ও সাদা রঙের হয়ে থাকে। এছাড়া তারা গলায় রূপার মালা, আধুলী মালা, সিকি মালা, রূপার চেইন জাতীয় অনেক অলংকার ব্যবহার করে। তারা কানে 'নুবেহ' অর্থাৎ কানফুল হাতেওজাকসিয়াহ্ অর্থাৎ রূপার চুড়িসহ বিভিন্ন অলংকার পরিধান করেন। ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ ও রমনী উভয়ই চুলে নিজেদের তৈরী কাঠের অথবা বাঁশের চিরুনি গুজে রাখে। এছাড়া মাথায় চুলের কাটা (রিকিলহ) ব্যবহার করে। বোম পুরুষরা অতীতে মহিলাদের ন্যায় কান ফোটাতেন এবং চুলের ঝুঁটি বাঁধতেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বোমরা বিভিন্ন সময় মৌসুমি ফুল নিজেদের কানে ও খোঁপায় পরেন। যাইহোক, বর্তমানে বোম পুরুষরা কান ফোটায় না বা তাদের চুলের ঝুঁটি বাঁধতে দেখা যায় না। বোমরা অতীতে হাতির দাঁতের তৈরী কান ফুল, হাতের কুচি, আংটি ইত্যাদি পড়তো। জুম চাষে উৎপাদিত ফুল দিয়ে বম রমনীরা বৈচিত্রপূর্ণ ফুলের মালা তৈরী করে এবং গির্জা সাজান। বোম পুরুষরা রুপোর নির্মিত বালা হাতে পরে এবং কান ছিদ্র করে রমনীদের ন্যায় রুপার তৈরী অলংকার পরে তাতে কোন ফুল গুঁজে রাখেন। বোমদের অলংকার ঐতিহ্যবাহী। তারা তাদের অলংকার পরিধানের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিকে পরম যত্নে ধরে রেখেছেন। বোমরা তাদের পোশাক পরিচ্ছদের জন্য পূর্বে স্বনির্ভর থাকলেও বর্তমানে বৈচিত্র্যপূর্ণ পোশাকের জন্য তাদের বাজার নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরফলে বর্হিবিশ্বের সাথে তাদের আন্ত সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার ফলে ঐতিহ্যগত সমাজ ব্যবস্থার শিথিলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং নতুন ধ্যান ধারনা করার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হচ্ছে যা বৃহত্তর সমাজের সাথে সংমিশ্রনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তবে উৎসবের দিনগুলোতে তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে।

গার্হস্থ্য সামগ্রী

বোমদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে নিজেদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তারা বন থেকে প্রাপ্ত গাছ, বাঁশ, ছন, পাতা, তুলা, ঝুমুর পাতা এবং পশুর চামড়া, পাখির পালক ও লেজ ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী ও বাদ্যযন্ত্র তৈরী করে। তারা বেত ও বাঁশ দিয়ে নানা জাতের ঝুড়ি, বর্ষার দিনে ব্যবহৃত ফালাউ টুপি ও সিকসিল তৈরী করেন। এগুলো তারা পাহাড়ে উৎপন্ন ঝুমুর বাঁশ থেকে প্রস্তুতকৃত বেত ও ঝুমুর পাতা দিয়ে তৈরী করেন। বাচ্চাদের দোলনা ও মাছ

Dhaka University Institutional Repository

ধরার ফাঁদ ইত্যাদি বাঁশ ও বেত দ্বারা তৈরী করেন। কাঠের ব্যবহারও বোম সমাজে লক্ষ্য করা যায়। তারা ঘরের মধ্যে কাঠের তৈরী সিড়ি ব্যবহার করেন। চরকা, ভাতের পাত্র, শূকরের খাদ্য পরিবেশনের পাত্রসহ অন্যান্য কাজে বমরা কাঠের ব্যবহার করে থাকেন। তারা ধান ভানার কাজে 'সুমতৌ' নামে কাঠ দ্বারা একটি যন্ত্র তৈরী করে। আর তাদের 'সুমমানখং' নামক ঢেঁকিও কাঠের তৈরী। জুমচাষে উৎপাদিত এক জাতীয় লাউয়ের খোলকে তারা পানি রাখার কাজে ব্যবহার করে। এজন্য প্রথমে লাউয়ের আগার দিকে মুখ তৈরী করে ১০-১২ দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে পচানোর পর ভিতরের বিচি ও অন্যান্য ময়লা পরিস্কার করে রৌদ্রে অথবা চুলায় শুকিয়ে পানি রাখার কাজে ব্যবহার করে। লাউয়ের খোল বিভিন্ন আকারের পাওয়া যায়। বোমরা পাহাড়ের চুড়ায় বসবাস করে বিধায় তাদের গ্রামের নীচে অনেকগুলো ছোট ছোট জলাধার থাকে। বোম ছেলে মেয়েরা ছোট লাউয়ের খোল দিয়ে এই জলাধার থেকে পানি সংগ্রহ করে। লাউয়ের খোলকে বোম ভাষায় 'তিওম' বলে। এছাড়া আর এক প্রকার লাউ তারা উৎপাদন করে যেটি আকৃতিতে অনেক ছোট এবং এগুলো তারা চামচ তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। বর্তমানে বোমরা তাদের রান্নার কাজে এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী হাড়ি পাতিল ব্যবহার করে। শহরের বোম পরিবার গুলোতে অত্যাধুনিক চীনা মাটির তৈরী বাসনপত্র লক্ষ্যনীয়। তবে পাহাড়বাসী বোমরা তাদের গৃহস্থালিতে মৃৎপাত্র ব্যবহার করে থাকে। এগুলো তার নিজেরা উৎপাদন করে না। এগুলো তারা বাজার থেকে সংগ্রহ করে। পাহাড়ী বোমরা তাদের রান্নার কাজে মাটির তৈরী উনুন ব্যবহার করে। শহরের শিক্ষিত বোমরা সিলিন্ডার গ্যাস এর উনুন রান্নার কাজে ব্যবহার করে।

বিচার ব্যবস্থা

বোম সমাজ সামাজিকভাবে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল প্রকৃতির। তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন প্রকার অন্যায় কিংবা ঝগড়া বিবাদ কিংবা শত্রুতার কারণ সৃষ্টি হয় তাহলে বোম সোস্যাল কাউন্সিল নামক তাদের নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে বিচার সালিশ করে সমাধান করা হয়। মধ্যে কখনো মামলা মোকাদ্দমায় যায় না। বিচারের ক্ষেত্রে বোম সমাজে কোন বিষয় নিয়ে শপথ বা অঙ্গীকার করাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। শপথকে তাদের ভাষায় বলা হয় 'সিয়াতসিরহ'। যদি বিচার সালিশের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সমঝোতায় না আসা যায় তবেই শপথের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় (রউফ পৃ ৮৯, ২০০৪)। বম সোস্যাল কাউন্সিল বোম সমাজেরই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সংগঠিত হয়। অধ্যয়নকালে তেমন কোন বিচার লক্ষ্যনীয় হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠন

জুম চাষ ও অর্থনীতি

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মানুষ খাদ্যের সংস্থান এবং জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে নানা উপায় ও কৌশল অবলম্বন করে আসছে। তার ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যগত ভাবে এক সমাজ ব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজ ব্যবস্থায় রুপান্তর ঘটেছে। এই পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার মূখ্য নির্দেশক হিসেবে অর্থনীতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিবর্তনের ধারা মানুষকে সভ্যতার দ্বার প্রান্তে পৌছতে সাহায্য করেছে, তা হচ্ছে একটি সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা। নৃবৈজ্ঞানিক ভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঐতিহ্যগত ও ধারাবাহিক ভাবে এসকল কৌশল দুরকমের হয়ে থাকে। একটি খাদ্য সংগ্রহ কৌশল এবং অন্যটি খাদ্য উৎপাদন কৌশল। প্রকৃতির যে সম্পদ যেভাবে যতটা দান করেছে তার রদবদল না করে সেগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাই হচ্ছে খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি। আর খাদ্য উৎপাদন কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সম্পদের রুপান্তর ও বাড়তি উৎপাদন। কোন সমাজই এদুটোর যেকোন একটির উপর নির্ভর থাকতে পারেনা। বোম সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সমাজের অর্থনীতি খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি সংগ্রহ অর্থনীতির ও অস্তিত্ব রয়েছে। অতীতে বমরা নিজেদের শিকারী জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতো। অনেকের মতে, অতীতে তারা গহীন অরন্যে বসবাস করতো এবং শিকারই ছিল তাদের একমাত্র মূল অর্থনৈতিক কৌশল (Loncheu, P-2,2003)। বিভিন্ন পশু পাখী শিকার করে তারা এগুলোর মাংসকেও শুকিয়ে রাখতো। পশুপাখি শিকার করার জন্য তারা নানা ধরনের অস্ত্র ও কৌশল ব্যবহার করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র ও কৌশল দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পশু ও পাখী শিকার করা হয়ে থাকে। অধ্যয়নকৃত বোম বসতিগুলোতে এখনো বিভিন্ন পশুপাখি শিকার করার অস্ত্র পাওয়া যায়। বোম সমাজের এরকম কিছু হাতিয়ার উল্লেখ করা হল । যেমন ঃ

থাং- এটি হরিণ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বন্য শুকর ধরার একটি কৌশল । জঙ্গলে পাওয়া এক ধরনের শক্ত লতা ও শক্ত গাছ দ্বারা এই কৌশল তৈরি করা হয়। এটি দিয়ে খুব সহজেই যে কোন পশু ধরা যায়।

সংখাং- এটি একটি পাখি ধরার কৌশল । একটি লম্বা বাঁশের গায়ে জঙ্গলে পাওয়া গাছ থেকে আঠা নিয়ে মেখে এমনভাবে এর মাঝখানে পাখীর জন্য খাবার রাখা হয় যাতে পাখিটি খাবার খেতে এসে বাঁশের গায়ে মাখানো আঠায় আটকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কয়সাই- কাঠ, রাবার এবং পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী শিকারীর এক ধরনের অস্ত্রের নাম। আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা মাটির ডেলা এ অস্ত্রে ব্যবহার করা হয়।

সাইতাক- পাখী শিকারে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি এক ধরনের তীর জাতীয় অস্ত্র। এ তীরটিও মাটির তৈরী ডেলা দিয়ে পাখী শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বিল- চিতাবাঘ, গুইসাপ, নকুল, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ধরার কৌশল এটি।

মেইথাল- বোমদের নিজেদের তৈরী বন্দুকের নাম মেইথাল। বোম সমাজে প্রায় সবার ঘরে এই ধরনের অস্ত্র রয়েছে।

মানহু খং- বাঁশ গাছ এবং বড় বড় পাথরের টুকরা দিয়ে এ কৌশলটি তৈরী করা হয়। সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী সুকৌশলে ধরার জন্য মানহু খং তৈরী করা হয়ে থাকে।

থাল- বাঁশ দিয়ে তৈরী সুচাঁলো অনেকটা তীর জাতীয় অস্ত্রের নাম থাল। এটি দ্বারা পশুকে বিঁধে শিকার করা হয়।

শিকারের পাশাপাশি বোমরা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির সাথেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে তাদের প্রধান অর্থনৈতিক উপজীবিকা হচ্ছে জুম। পাহাড়ের ঢালে বিশেষ কায়দায় তারা জুম চাষ করেন। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সুবিধামত একখন্ড জঙ্গলভূমি ঠিক করা হয় সাধারণত এক্ষেত্রে বাঁশ ঝোপ বিশিষ্ট পাহাড়ের গায়ের ঢালু জায়গাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তারপর এর জঙ্গলভূমির সমস্ত বাঁশ, ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় গাছের নিচের ডালপালা কেটে ফেলা হয়। গাছপালা কাটার পর এই কর্তিত ভূমিকে রৌদ্রে শুকানোর জন্য কিছুদিন ফেলে রাখা হয় এবং এপ্রিল মাসে এতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। যদি এই জঙ্গল কাটার পর একদিনও বৃষ্টি না হয় এবং বেশ শুকিয়ে যায় তবে বড় বড় গাছগুলো ও পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং জমিও ২/১ ইঞ্চি গভীর হয়ে পুড়ে যায়- এমতাবস্থায় বৃষ্টির অপেক্ষা না করে আর উপায় নাই। যখনই ভারী বৃষ্টিতে জমি ভিজে যায় তখনই বোনার কাজ শুরু হয়। ধান, তুলা, তরমুজ ইত্যাদি বিভিন্ন বীজ একত্রে মিশ্রিত অবস্থায় বপন করা হয়। এ পদ্ধতিতে সমস্ত বীজ একত্রে একটি পাত্রে মিশ্রিত করে বপনকারী একটি দা বা কাটারীর সাহায্যে জমিতে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে এই মিশ্রিত বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখে। জুম চাষে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল বা তরিতরকারী জন্মে এবং যথাসময়ে তা সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ পরিশ্রম ও সর্বদা সজাগ যত্নের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ফসল কাটা বা তোলার সময় অন্য যে সব ফসলের চারাগাছ রয়েছে সেগুলোর দিকে বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

যত্ন নিতে হয়। এছাড়াও বন্য শুকর, বানর, কাকতাড়ুয়া, ইঁদুর প্রভৃতির আক্রমন হতে রক্ষা করার জন্য পাহারার প্রয়োজন হয়। জুম চাষের বাৎসরিক কর্মসূচীর তালিকা নিম্নরূপঃ

মাস	সমভূমিতে কাজ	জুমভূমিতে কাজ	অন্যান্য কাজ
জানুযারী	ধান মাড়াই ও গুদাম জাত করা। লাঙ্গল ও মই দ্বারা ধানের জমি চাষ করা সরিষা কাটা।	ভাল বাঁশ রেখে জুম চাষের জঙ্গল পরিস্কার করা।	ঘরবাড়িতৈরীওমেরামত ।স্ত্রীলোকেরা জ্বালানী সংগ্রহ, ঝুড়ি তৈরী সুতা কাটা কাপড়ের রং করা।
ফেব্রুয়ারী	সরিষাকাটাওমাড়াই। তামাক, মরিচ, আলু ও তরিতরকারী তোলা।	জুমক্ষেত্র তৈরীর জন্য জঙ্গল পরিস্কার।	--
মার্চ	আউস ধান লাগানো। পাটের জন্য রবিশস্যেও ক্ষেত চাষ করা।	--	--
এপ্রিল	জমি চাষ করা ও পাট, ধান বপন করা।	জঙ্গলপোড়ানো।	জুমে কুড়েঘর তৈরী।
মে	আমন ধানের বীজ জমিতে লাগানো।	প্রথমবৃষ্টির সঙ্গে তৈরীকৃতজুমক্ষত্রে বপনেরকাজ শুরু।	রোপন কাজে ব্যস্ত।
জুন	আউস ধান কাটা ও আমন ধানের জন্য জমি চাষ ও মই দেয়া।	দ্রুত রোপনের কাজ করা।	বয়নের কাজ বন্ধ।
জুলাই	--	লতাগুল্ম পরিস্কার, শাক সব্জি সংগ্রহ।	--
আগষ্ট	পাট কাটা, পচানো, শুকানো।	গব্জি প্রথমার্ধের ধান, তুলাতিল ইত্যাদি জমিথেকে সংগ্রহ।	--

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর	রবিশস্যযেমন- সরিষা,পেয়াজ,মরিচ ইত্যাদি বপনের জন্য জমি প্রস্তুত করা।	শেষার্ধেও ধান কাটা।	বিক্রয়ের জন্য বাঁশ ও ঘাস কাটা।
অক্টোবর	--	--	--
নভেম্বর	আমন কাটা ও আউস ধানের জমি চাষ।	জুমের কাজ শেষ এবং জুম ক্ষেত্র পুনরায় লতাপাতায় ভরে যাওয়া।	বস্ত্র বয়নের কাজ শুরু।
ডিসেম্বর	--	--	--

(বেসেইনে, পৃ১৬-১৭, ১৯৯৬)।

জুম চাষের মাধ্যমে বোমরা ধান, ভূট্টা, মরিচ, শিম, কাকরোল, তিল, কার্পাস, হলুদ, আদা, ঢেড়শ, শসা, কুমড়া ইত্যাদি উৎপাদন করে। এছাড়াও বোমরা আনারস, কমলা, পেঁপে, আম, কাঁঠাল, কাজু বাদাম, কচু ইত্যাদিসহ কমলালেবু ও চা চাষ করে। বোমদের প্রধান কারিগরি যন্ত্র হল দা, লাঙ্গল, মই, কাচি, কোদাল, নিড়ানি। এই সকল যন্ত্র দ্বারা তারা জমির আগাছা পরিস্কার, বাঁশের বিভিন্ন আকৃতির হস্তচালিত জিনিস ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাঁশ বোমদের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তারা বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ঝুড়ি, বেড়ানোর ছড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। বোম নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে আবার কতক ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করে থাকে। নিম্নে বোম নৃগোষ্ঠীর নারী-পুরুষের কার্যক্রমের একটি তালিকা দেখানো হলঃ

পুরুষ	নারী	উভয়েই
চাকুরী, জঙ্গল পরিস্কার করে জুম চাষের উপযোগী করে তোলা, জুম কাটা বীজ বপন করা, ঝুড়ি ঝুপড়ি তৈরী করা, কাঠে কাজ মাদুর, দোলনা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করা দুধ ধোয়ানো, শিকার করা, মাছ ধরা বাজারে যাওয়া।	চাকুরী, তাঁত চালনা, ঘরবাড়ী পরিস্কার রাখা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, রান্না করা, সন্ত ানদের ও বৃদ্ধদের দেখাশুনা করা ও সংসারেরযাবতীয় সরঞ্জাম ঠিক করা।	চাকুরী, জুম চাষে সক্রিয় অংশগ্রহণ, ছেলে-মেয়ে ও গৃহপালিত পশুর যত্ন নেয়া, নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি নিষ্কাশন করে চুপড়ি দিয়ে মাছ ধরা।

(মাঠকর্ম ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

বোম সমাজের অর্থনীতিতে নারী পুরুষে সম অংশ গ্রহনই লক্ষ্য করা যায়। বোম অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সবজি চাষ। বিশেষত: বোম নারীরা তাদের বাড়ীর আঙিনায় ও চারপাশে বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন আনারস, কলা, পেপে, আদা, কমলা, আম, কাঠাল, আলু, শসা, পেয়ারা, বরবটি, কাঁচামরিচ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সজিগুলো চাষ করে। এগুলোকে তারা নিত্য দিনের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিক্রি করে থাকে।

বাজার ব্যবস্থা

বান্দরবান জেলা সদরের পাশাপাশিতে যে বোম গ্রামগুলো অবস্থিত তারা সাধারনত বান্দরবান শহরেই ক্রয় বিক্রয় করার জন্য আসে। অর্থাৎ বান্দরবান হতে চিম্বুক পাহাড় যাওয়ার পথে যে বোম পাড়াসমূহ রয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা বাজারের বিক্রি কিংবা কেনার জন্য বান্দরবান শহরেই চলে আসে । এই গ্রাম সমূহের নাম হচ্ছে লাইমিগ্রাম, ফারুকগ্রাম, শেরনগ্রাম, গেথসিমনি গ্রাম। এরা অনেক ক্ষেত্রে পাঁয়ে হেঁটে কিংবা গাড়ীতে করে বান্দরবান সদর বাজারে আসে। এছাড়া প্রত্যেকটি গ্রামেই বিকালে একটি ক্ষুদ্র বাজারের মত বসে। এটি সাধারনত ঐ গ্রাম সমুহের অধিবাসীদের নিত্য দিনের চাহিদার উপর নির্ভর করে বাজার বসে। এই ক্ষুদ্র বাজার গুলোতে মাছ, ঋতুভিত্তিক সজি ও ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রতিটি গ্রামেই কয়েকটি করে দোকান রয়েছে। সেখান থেকে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে থাকে। এ ধরনের বাজারগুলো সাধারনত বিকালে বসে।

পেশার বিভিন্নতা

বর্তমানে জুম চাষের জমির অভাব, উর্বরতা হ্রাস এবং ক্রমাগত বনভূমি উজাড় হওয়ার ফলে জীবনধারা বদলে যাচ্ছে। ফলে তাদের জীবনাচারে অনেক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে তাদের পেশার উপর। বর্তমানে বোমরা জুম চাষ ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও সম্পৃক্ত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারের ফলে বোমরা বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছে। জুম চাষ ছাড়া সাধারনত বোম সমাজে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই যে সকল পেশার অস্তিত্ব দেখা যায় এগুলো হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য, সজি ও ফলের চাষ, তাঁত শিল্প, দোকানদার তথা ক্ষুদ্রব্যবসা, ট্যুরিষ্ট গাইড ও দিন মজুর। এই বৈচিত্র্যময় পেশার কারণে তাদের সহজ সরল জীবন ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে। বোম সমাজের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে । যেমন- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী হাসপাতালে নার্সিং- পেশায় নিয়োজিত। এছাড়া ঢাকা ও চট্রগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন এন জি ও তে চাকুরী করেন। মহিলারা বাড়ীতে তাঁত শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত কাপড় নিজেদের চাহিদা পূরন করে বাজারে বিক্রি করে। এছাড়া বোম মেয়েরা ছোট ছোট দোকানে তাদের তৈরী হাতপাখা, মুড়ি, কম্বল, মুখোশ, চায়ের মগ, ইত্যাদি বিভিন্ন তৈজসপত্র ও বিক্রি করে। এসকল ক্ষেত্রে পুরুষরা সমানভাবে অংশগ্রহন করে। বোমদের মধ্যে ছোট বড় ব্যবসায়ী রয়েছে। এরা সাধারণত কাঠ, কাঠের তৈরি সামগ্রী, ইত্যাদির ব্যবসা করে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পশু ধরার কৌশল, ঝুড়ি, চাল, ডাল, তৈল ইত্যাদি সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে। দিন মজুরের ক্ষেত্রেও বোম নারী ও পুরুষরা উভয়েই কাজ করে। পুরুষরা বড় বড় গাছ কাটা, মাটি কাটা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। অন্যদিকে মহিলারা বনভূমি থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে নিজেদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে থাকে। বোমদের আয়ের আরেকটি উৎস হচ্ছে বন্য পশু লালন-পালন। প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারেই শূকর, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি পোষা হয় এবং এগুলো তাদের আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে । ইদানিং বোম নৃগোষ্ঠীর মধ্যে আরেকটি নতুন পেশার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। এটি হচ্ছে ট্যুরিষ্ট গাইড। বাঙালী কিংবা বিদেশী পর্যটক যারা রুমা বাজার কিংবা রুমা বাজার হতে কেউক্রাডাং পাহাড় পর্যন্ত ভ্রমনে যায় তখন তারা পর্যটকদের সাথে গাইড হিসেবে কাজ করে। তবে কোন সাংগঠনিক অফিস নেই। তথাপি বোমদের মধ্যে যারা এধরনের গাইডের কাজ করে তারা সেখানকার সকলের পরিচিত। এক্ষেত্রে গাইডরা দৈনিক ভিত্তিতে তাদের সম্মানী নির্ধারন করে থাকে। বোমদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন ভিক্ষুক নেই। যদি কারো অর্থনৈতিক দুরবস্থা বেশী থাকে তাহলে তাকে সম্মিলিত ভাবে সহায়তা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক সংগঠন

সকল মানব সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন লক্ষ্যনীয়। ইহা প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় প্রকারের হতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক সংগঠন এবং নেতৃত্বও পরিবর্তিত হয়। বান্দরবানের বোম নৃগোষ্ঠীরা এর ব্যতিক্রম নয়। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক আইন বোম নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে নেই। সমাজেই গোত্রভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্যনীয়। এটি নেতৃত্বের একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা এবং বৈধতা গোত্র ভিত্তিক, প্রত্যেক সমাজেরই ঐতিহ্যগতভাবে একজন প্রধান থাকে যা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে এমনি ভাবে বর্তমান অধ্যয়নকৃত সমাজে সমাজপ্রধান 'কারবারী' নামে পরিচিত, যিনি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার একক। সাধারণত কারবারীর দায়িত্ব উক্ত সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করা এবং সমাজের আচার-আচরণ পরিচালনা করা। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের মত বোমদেরও রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের রাজনৈতিক সংগঠনটি তিনটি কাঠামো দ্বারা গঠিত। আর তা হচ্ছে- গোত্র ভিত্তিক, প্রশাসনিক কাঠামো এবং বিচার ব্যবস্থা। বোমদের এই গোত্র ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো ও বিচার ব্যবস্থা আলোচনা করার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ এই অঞ্চলে বসবাসরত সকল নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতা ও নেতৃত্বের ব্যাপারে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রফেসর পিয়ের বেসেইনে প্রণীত 'Tribesmen of Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক বইটিতে আদিবাসীদের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে এ বইটি অনুসারে, বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত বরাবর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দক্ষিণে মায়ানমারের আরাকান রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য ভূমিই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রশাসনিকভাবে চট্টগ্রাম বিভাগের অংশ। ১৮৬০ সালের আগে পর্যন্ত বৃটিশরা সরাসরি পার্বত্য অঞ্চলের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮৬০ সালে পার্বত্য অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলা থেকে স্বতন্ত্র করে Superintendent Hill Tribes পদবী নামধারী একজন অফিসারকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শান্তিরক্ষা ও নৃগোষ্ঠীদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নিয়োগ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ১৮৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যপরিধি বিস্তৃত করে বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পন করে ডেপুটি কমিশনার পদ সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত, তাই প্রশাসনিক কার্যক্রমের সুবিধার জন্য ততকালীন বাংলা সরকার ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এই বিস্তৃত পার্বত্য ভূমিকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করেন। এগুলো হচ্ছে– (১) চাকমা সার্কেল (২) বোমাং সার্কেল (৩) মং সার্কেল এবং প্রত্যেক সার্কেলে একজন করে রাজা বা প্রধান নিযুক্ত করেন (Hutchinson, 42, 1909)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন দুইটি রাষ্ট্র তথা ভারত ও পাকিস্তান হওয়ার পর এতদ অঞ্চল পাকিস্তনের একটি প্রদেশ যা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং এর সদর দফতর হয় বাঙামাটি। এই জেলা একজন ডেপুটি কমিশনারের আওতাভূক্ত হয়। ডেপুটি কমিশনার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই জেলাকে প্রশাসনিকভাবে তিনটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। যথা-রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। প্রত্যেক মহকুমা একজন মহকুমা হাকীমের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। প্রত্যেকটি মহকুমা আবার কতগুলো থানায় বিভক্ত। উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি মহকুমা যেমন বাঙালী অফিসারদের অধীনে তেমনি তা আবার অনুরূপ তিনটি সার্কেলও প্রশাসনিক ভাবে বিভক্ত। প্রত্যেক সার্কেলের প্রধান হচ্ছে-সর্দার বা রাজা। এই সার্কেল আবার কতগুলো মৌজায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক মৌজায় একজন করে হেডম্যান রয়েছে। মৌজা আবার গ্রামে বিভক্ত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছে কারবারী। এই শাসন পদ্ধতি পূর্ব পাকিস্তানে অন্যস্থান হতে আলাদা ছিল। কারন এখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রচলিত ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই প্রশাসনিক কাঠামো করা হয়ছে। তবে চাকমা, মং, বোমাং এই তিন রাজাকে আদিবাসী সর্দার বলা যায় না। কারণ কোন আইনগত স্বীকৃতি না থাকায় এই রাজারা কোন রাজনৈতিক ধরনের ঐতিহ্যগত বা প্রশাসনিক কাজ করেন না। এরা কেবলমাত্র সংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয় রক্ষা করে। এই রাজা কারবারী ও মাতবর এর পদ বংশানুক্রমিক। (Hutchinson, 42, 1909)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এই সময় পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর অধিকার সংরক্ষন করার উদ্দেশ্য ঐরষষ ফরংঃৎরপঃ পড়ঁহপরষ এবং ১৯৯৭ সালে Chittagong Hill Tracts Regional Council & Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs গঠন করা হয়।The Ministry of Chittagong Hill Tracts-এ একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। যেখানে সরকারের মনোনীত তিনজন এমপি, তিনজন রাজা এবং বাঙালীদের

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তিনজন প্রতিনিধি থাকবে। এছাড়া বাঙালী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৭ সালে সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর মূল রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে খ্যাত (বাতেন, পৃ ১৭, ২০০৩ । এছাড়াও ১৯৯৮সালে পাচবিম (সম) আঞ্চলিক পরিষদ ১/৯৮/২ নম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২২সদস্য বিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ ঘোষনা করে। এই ঘোষনা অনুযায়ী ২২সদস্য বিশিষ্ট গঠিত এই পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে নির্ধারন করতে হবে। শান্তি চুক্তি অনুসারে পরিষদ সদস্যরা হবেন নিম্নরূপঃচেয়ারম্যান-১জন, চাকমা- ৫জন, মারমা-৩জন, ত্রিপুরা-২জন, ত্রো বা তঞ্চংগা-১জন, লুসাই, বম, পাংখোয়া, খুমি, চাক- ১জন। তিন পার্বত্য জেলার প্রতিটিতে দুজন করে মোট ৬জন, বৃহত্তর সমাজের বা বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে সদস্য নির্বাচনের বিধান থাকবে আঞ্চলিক পরিষদে। পরিষদের তিনজন মহিলা সদস্যের মধ্যে একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (চাকমা) এবং দুজন বাঙ্গালী, সর্বমোট সদস্য হবে (১৩+৬+৩)=২২ জন (বাতেন, পৃ ১৮-১৯,২০০২)। বোমরা জাতীয় রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনা। তবে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে। অনুশাসন কিংবা বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রবর্তিত পদ্ধতি মেনে চলে। বোমদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারির ঘটনা খুবই বিরল। যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় তবে তারা গ্রামেই সালিশের মাধ্যমে এসবের মিমাংসা করে। বোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদের জন্য দেশের আইন আদালত বা থানার শরণাপন্ন হয়েছে এরকম নজির একেবারে নেই বললেই চলে। বোম সমাজে শপথ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শপথকে তাদের ভাষায় বলে 'সিয়াতসিরহ'। বিচার সালিশের মাধ্যমে যদি কোন বিষয়ে সমঝোতায় না আসা যায় তাহলে শপথের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বিচার সালিশের জন্য বোম সমাজ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে 'জানবু বা বোম কাষ্টমারী ল' নামে একটি আইনের বই প্রকাশ করেছে। তারা কঠোরভাবে এই আইনি পুস্তকের নিয়মনীতি মেনে চলে। "বোম কাষ্টমারী ল" বইটি সংবিধানের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে এবং বোম সমাজের সকলেই তা অত্যন্ত সম্মানের সহিত মেনে চলে। বোম সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন ভিত্তিক তেমন কোন বিভেদ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হিসেবে একজন বোম প্রতিনিধি রয়েছেন। বোম সমাজের মহিলারা সক্রিয়ভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। তবে তারা ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বোম সংস্কৃতি ও সংগঠন

বোম সংস্কৃতির শিল্প ও চারুকলা

'বোম' নৃগোষ্ঠীরা উন্নত আনুষ্ঠানিক জীবন এবং তার সাথে যুক্তঐতিহ্যগত শিল্পের প্রতি আগ্রহশীল। তাদের জীবনে নাচ, গান, কবিতা ইত্যাদির বিশেষ ব্যবহার রয়েছে। তাদের নিজস্ব গান নাচের ধারা রয়েছে। পারিবারিক ও উৎসবঅনুষ্ঠানে তারা এই নাচ গান পরিবেশন করে। যেকোন উৎসব অনুষ্ঠানে রাত জেগে যুবক যুবতীরা নাচ গান করে। বোমরা গহীন অরন্যে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করে তথাপি তাদের ঐতিহ্যগত নাচ ও গানের ব্যবস্থা আছে। এগুলো তারা খুব আনন্দঘন পরিবেশে উপভোগ করে থাকে। বোমদের নিজস্ব গানগুলো লিখিত ছিল না, অধিকাংশ লোক মুখে পরবর্তী বংশধরদের জন্য শেখানো হত। তবে বর্তমানে এগুলোকে অনেকাংশে লিখিতভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বোমদের গানগুলোতে যেমন আছে প্রেম ভালবাসা, তেমনি বিরহ ব্যথা ও দেশাত্মবোধের সমৃদ্ধ চেতনাশক্তি। বোমদের নিজস্ব একটি গান নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

লান আ পি পু নুন দান তলা
কুম তাম তাক হেন তলাউ রহ খম লে;
কান বম নুন দানে কান হলো লাই
রাল লেই কান কাই বাক লাই রহ
অ বম রাম জাংফাহ তো লালপা
তো লিয়াও রোয়াল নাও মেল ঠা তলা
নু ঙাক তলাং ভাল তলা
চেইথকওকানটুয়ান লাই রহ। (আলহ,,পৃ১৪৩, ২০০৭)

অর্থ-'হাজার বছরের আমাদের হারিয়ে যাওয়া পুরোনো ঐতিহ্য খুজে বের করব, সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করো, সুশ্রী যুবক যুবতীরা জেগে উঠো। সমাজ উন্নয়নের কাজ সবাই মিলে মিশে করব।' বোমরা বহু ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। যেমন- ঝাঁজ, গীটার, ঘন্টা, বড় ঢোল, ছোট ঢোল, গয়ালের শিং, বাঁশি, মুখ বাঁশি, এবং রিয়দ ইত্যাদি। বোমদের কতগুলো বিখ্যাত গান হচ্ছে (ক) অতংলা (লোকগীত) খ)

Dhaka University Institutional Repository

কাইলেখ লা (নিজস্ব সুর দেয়া) গ) শাকা লা (শিকারী গান) ঘ) লাড়/ভাউর লা (বিখ্যাত বন্য জন্তুর শিকারী গান) ঙ) সালু লামাহ লা (জন্তুর মাথা নিয়ে গাওয়া গান) চ) সাভাংলা (দলীয় গান) ছ) খোয়াংচুই লা (সম্মান দেয়ার গান) (Loncheu, চ-৩,২০০৩)। যেকোন উৎসব অনুষ্ঠানে বোম সম্প্রদায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে। এর মধ্যে থাইখাং, মিমিম, রিরত, ভরে, ভারখুয়াং, টিংটাং, পেংলং, ভারসন, শিয়াকি, খোয়াং ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো তৈরীর প্রনালী বর্ণনা করা হলঃ

থাইখাং- বাঁশের তৈরী বাদ্যযন্ত্র

মিমিম- বাঁশের তৈরী বাঁশি জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

রিরত- দেখতে একতারা মত এ বাদ্যযন্ত্রটি বয়স্ক ব্যক্তিরা বেশি ব্যবহার করে।

ভরে- এটি একটি ছোট ঘন্টা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

ভারখুয়াং- মাঝখানটা উচু করে তৈরী করা বড় ঘন্টার নাম ভারখুয়াং।

টিংটাং- বোমদের নিজস্ব তৈরী গিটার।

পেংলেং- এটি এক ধরনের বাঁশি।

শিয়াকি- গয়ালের শিং দ্বারা তৈরী একটি বাদ্যযন্ত্র যা নৃত্যগীতে ব্যবহার করে।

খোয়াং- ঢোল জাতির বাদ্যযন্ত্র। এটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও গির্জাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় (রউফ, পৃ ৮৭, ২০০৪) ।

বোম সমাজের গান ও নৃত্যগুলো সাধারণত বিষয় ভিত্তিক ও ঘটনার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশন করা হয়। যেমন- দেশাত্মবোধক গান, প্রেম ভালবাসার গান, উৎসব ভিত্তিক গান, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সংক্রান্ত গান। তেমনি নৃত্যের ক্ষেত্রে তংলাই, জুয়াং রোখা তাললাম, সাভাং রোয়াই, পারলাম, সিয়াকি দেংলাম ইত্যাদি রয়েছে। এখানে একক, দ্বৈত এবং দলীয়ভাবে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সাধারণত বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান গুলোতে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা নাচ ও গান পরিবেশন করা হয়। নাচকে বোম ভাষায় "লাম" বলে এবং গানকে বোম ভাষায় 'লা' বলে। বোম সমাজের জনপ্রিয় নাচগুলো হচ্ছে-

রোখা নৃত্য- এটি বাঁশের নৃত্য।

পারলাম নৃত্য -এটি হচ্ছে পুষ্প নৃত্য।

সাভাং রোয়াই -দলীয় উৎসব নৃত্য।

সালু লামাহ -প্রানীর মাথা নিয়ে নৃত্য।

Dhaka University Institutional Repository

সানু তেরহ -দুষ্ট আত্মার বিতাড়ন সংক্রান্ত নৃত্য।

খাওয়াভেল লাম -দলীয় উৎসব নৃত্য।

অতীতে বোমসমাজে নানা প্রকার নৃত্যের প্রচলন ছিল। এগুলোর মাধ্যমে মৃতের আত্মা শান্তি লাভ করবে এরুপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে প্রাচীন বোম সমাজ তিন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করতো। এগুলো হচ্ছে-

চাংলাই জুয়াংঃ প্রাচীন বোমরা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পর যে কোনা মানুষের আত্মা স্বর্গে চলে যায়। এক্ষেত্রে 'সানু' নামক দেবতা মৃতের আত্মাকে স্বর্গে যাওয়ার বাধা সৃষ্টি করে। তাই মৃতের আত্মা যাতে কোন রুপ বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য 'সানু' দেবতার সন্তুষ্টি বিধানে মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে চাংলাই জুয়াং নৃত্যের আয়োজন করা হতো। এ নৃত্য পুরুষেরাই পরিবেশন করতো।

রোখাতাঃ প্রাচীন বোম সমাজে কোনো মহিলা সন্তান প্রসবকালে মারা গেলে তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষে ভোজের আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে রোখাতো নৃত্যের আয়োজন করা হতো।

শিয়াকিদিংঃ কোন ছেলে মারা গেলে তার আত্মাকে সাহস যোগানোর জন্য গয়ালের শিং পিটিয়ে যে নৃত্য পরিবেশন করা হতো তাকে শিয়াকিদিং নৃত্য বলে। (রউফ, পৃ৮৮,২০০৪)

প্রবাদপ্রবচন সমাজ জীবনের এক আবশ্যকীয় অনুসঙ্গ। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, লোকচরিত্র, সামাজিক মানুষের নানাবিধ অভিব্যক্তি প্রবাদ প্রবচনে ওঠে আসে। বোম সমাজের এমন কিছু প্রবাদ প্রবচন নিম্নে দেয়া হলো

কপ ছাদাক লে বিয়াংলহ টাং। (নীতিহীন লোক)

যে পাত্রে রাখা সে পাত্রের আকার ধারন করে।

সাইপুম পেহ্ ।

(মিথ্যাবাদীদের বিশ্বাস নেই)

চিল সাক থিয়ামেলী মাহলাক।

(যে লোক থুথু ফেলতে জানেনা তার নিজের গায়েই থুথু পড়ে)

নো লে পা থো ঙাইলৌ, যাবুই লাম থ্লাৎ রিল।

(গুরুজনের কথা না মানলে বিপদে পড়ে)

Dhaka University Institutional Repository

মোর শোত কাম খাং।

(খাওয়ার প্রতি যার লোভ তাকে কেহ ভাল চোখে দেখে না)। (বাবুল, পৃ ৪১,২০০১)।

বাৎসরিক উৎসব

বোমসম্প্রদায়ের স্বকীয়মন্ডিত ও স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে। এদের সাংস্কৃতিক বিচিত্রতার সঙ্গে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য পূর্ণ হয় না। এরা পারিবারিক সামাজিক ও ধর্মীয় নানা প্রকার অনুষ্ঠান উদযাপনে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী গান ও নৃত্যের উপস্থাপনায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশকে তুলে ধরে। বর্তমানে বোমরা খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের বাৎসরিক উৎসবাদি ও খ্রীষ্ট ধর্মের আলোকেই সম্পাদিত হয়। নিম্নে বোম সমাজের বাৎসরিক কয়েকটি উৎসবের বর্ণনা দেয়া হলঃ

বর্ষ বিদায়

বোমরা সাধারনত ৩১ শে ডিসেম্বর রাতে বর্ষ বিদায়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বিভিন্ন গ্রামে গির্জায় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা সকলেই একসঙ্গে অংশ গ্রহন করে। বর্ষ বিদায় অনুষ্ঠান রাত ১১ঃ৩০ মিনিটে হয়ে থাকে। বিদায়ী বর্ষকে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সাথে তুলনা করা হয়। এমনভাবে সাজিয়ে দেখানো হয় যে, ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরিয়ে দুজন সমবেতভাবে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হয়ে সবার প্রতি পুরনো বছরের পরিচয় দিয়ে সবার কাছে বিদায় নিতে থাকে।

বর্ষ বরণ (ফুমথা)

বোমদের ইংরেজী নববর্ষ অর্থাৎ পহেলা জানুয়ারী কে নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করতে দেখা যায়। পহেলা জানুয়ারী দিনটিতে মধ্যরাত থেকে সারাদিনের জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। বিশেষতঃ গ্রাম গঞ্জে সবাই মিলে মিশে এদিনে বাড়ীতে বিশেষ ভুরিভোজন আয়োজন করে। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজন করে। ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারা বিভিন্ন দলে দলে নাচগান করে। এদিনে প্রতিযোগীতামূলক ভাবে খেলাধূলা, গানের অনুষ্ঠান এবং নৃত্য পরিবেশিত হয়।

প্রতিযোগীতার শেষে অংশগ্রহন কারী এবং বিজিতদের মাঝে পুরস্কার বিতরন ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। তাদের বর্ষ বরনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণ ভাবে করা হয় । এই অনুষ্ঠানে ৩১ শে

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর রাত ১১:৪৫ এর দিকে দুইজন যুবক যুবতীকে সাজিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে আনা হয় এবং সমবেত সবাইকে তারা নতুন বছরের স্বাগত বার্তা জানায়। এভাবে তারা বর্ষবরন করে থাকে। এছাড়াও তারা বাংলা নববর্ষে অর্থাৎ ১লা বৈশাখেও বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। এই উৎসবটি বোমরা সমাজ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে। এটি বিজু উৎসব নামে পরিচিত। বোমরা উৎসবের দিন গুলোতে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে।

নবান্ন উৎসব (থাইথার কুট)

নবান্ন উৎসব বোম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আদিকাল হতে বোম পূর্ব পুরুষরা এ ধরনের উৎসব উদযাপন করে আসছে। অতীতে নবান্ন উৎসব হতো পরিবার ভিত্তিক। বোমরা আদিকাল থেকেই জুমচাষ ভিত্তিক জীবিকা নির্ভর ছিল। এই জুমচাষের ফসলাদি নিয়েই নবান্ন উৎসব করা হয়। বর্তমানে বোমরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহন করার পর থেকে নবান্ন উৎসব পাড়া ভিত্তিক মিলে মিশে একসাথে আয়োজন করে। জুমের ফসলাদি ঘরে এনে ভালো ফসলগুলো গির্জায় নিয়ে যায় এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে সর্মপন করে। নবান্ন উৎসবের দিন জুমের উৎপাদিত ফসলগুলো গীর্জায় সর্মপন পর প্রার্থনা শেষে গীর্জা প্রাঙ্গনে সবাই মিলে মিশে একসাথে অংশগ্রহন করে উপভোগ করে । কোন কোন বছর পাড়ার সকলে মিলে নবান্ন উৎসবের দিনে খাবার পরিবেশন করে। অতীত হতে আজ পর্যন্ত বোমরা এই উৎসব গুলোতে আনন্দের সহিত পালন করে আসছে। বর্তমানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারনে বোম সমাজের এই সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। পূর্বে সম্পূর্ন জুম চাষ ভিত্তিক অর্থনীতি থাকলেও এখন বোমরা বিভিন্ন অকৃষি পেশা ভিত্তিক জীবনে অভ্যস্ত। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যগতভাবে এই অনুষ্ঠান গুলো পালন করা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ খ্রীষ্টান ধর্মের কারনে তাঁদের প্রাচীন এবং ঐতিহ্যগত অনেক চিন্তাধারা তথা অনেক আনুষ্ঠানিকতা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যনীয়।

জীবনের সন্ধিঃক্ষনের আচার ও আনুষ্ঠানিকতা

নৃবিজ্ঞানে আচার (Ritual) হচ্ছে বিশ্বাসের প্রথাবদ্ধ আচরিত রূপ। আচারে অংশগ্রহনকারীদের নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করতে হয়। আচারের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অংশগ্রহনকারীদের প্রায় প্রতিটি আচরন, অঙ্গভঙ্গী, উচ্চারন সব কিছুই গুরুত্ব বহন করে। অর্ন্তদৃষ্টিগতভাবে পর্যবেক্ষন করলে বেশীরভাগ আচারের কোন ব্যবহারিক তাৎপর্য নেই। সামাজিকতার ক্ষেত্রে আচারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জীবনের সন্ধিক্ষন হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি। এই পর্যায়গুলোকে ঘিরে সমাজের মানুষ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে। সকল সমাজে এমন বহুবিধ ও ভিন্নভিন্ন আচার রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এই ধরনের আচার সমাজের সদস্যদের যৌথতা, সংহতি প্রকাশ ও লালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এক অবস্থা হতে আরেক অবস্থায় উপনীত হতে হয়, ফলে বদলে যায় তার সামাজিক ভূমিকা বা পরিচিতি। এই অবস্থা বদলের সময়গুলোতে যেমন একটি শিশুর নামকরন একজন নারী কিংবা পুরুষের বিয়ে, ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহন ইত্যাদি বহু উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বোম সমাজের অধিবাসীদের জীবনে এমন অনেক আচার অনুষ্ঠান রয়েছে যা তাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও আচার অনুষ্ঠানগুলো অন্যান্য সমাজ বা নৃগোষ্ঠী থেকে যেমন পৃথক করেছে তেমনিও একটি সমৃদ্ধশালী সহজ সরল জীবন গঠনে ভূমিকা পালন করছে। বোম সমাজের এমন কিছু আচারের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

জন্ম সংক্রান্ত আচার

বোম সমাজে নবজাতকের জন্মদান সৃষ্টিকর্তার আর্শীবাদ বলে মনে করা হয়। বোমরা জন্ম, গর্ভ নষ্ট ইত্যাদিকে পরিবারের ভাগ্য বলে মনে করে। পাশাপাশি দম্পতির অতীত কোন পাপের প্রায়শ্চিত্য বলেও বিশ্বাস করে। বোম সমাজে গর্ভবতী মহিলারা সামাজিক ভাবে রীতিনীতি মেনে চলে। সাধারনত গর্ভবতী মহিলাদের নিম্নোক্ত নিষেধাজ্ঞা গুলো মেনে চলতে হয়। যেমন-

১) গর্ভবতী মহিলারা বিকালে একা পানি আনতে যেতে পারেনা।

২) গর্ভবতী মহিলারা গোরস্থানে যেতে পারে না, মৃত ব্যক্তিতে স্পর্শ করতে পারে না।

৩) গর্ভবতী মহিলারা একা জঙ্গলে যেতে পারে না।

৪) সে নিজেকে কোন প্রকার ভারী কাজের সাথে সংযুক্ত করতে পারবে না।

বোম সমাজে বিবাহিত মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হলে গর্ভবতী হওয়ার প্রথম লক্ষন বলে ধারনা করা হয়। তিন চার মাস ঋতুস্রাব বন্ধ থাকার পর মহিলারা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের জানায়। তার পর হতে তাকে সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্র হিসেবে কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী তার মায়ের বাড়ীও নির্ধারন করে। তবে সন্তান প্রসবের কার্যটি শুধুমাত্র বম দাই দ্বারাই সম্পাদন করতে হয়। তার সঙ্গে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ আত্নীয়ারা থাকেন ।তবে বর্তমানে সীমিতভাবে হলেও চিকিৎসা জগতে পরিবর্তনের ফলে থানা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে গিয়ে সন্তান প্রসব করানো হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে উল্লেখ করা যায় যে, বোমরা ক্রমান্বয়ে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সন্তান প্রসবের পর বোম সমাজে পিতা-মাতাকে কয়েকটি আচার পালন করতে হয়। তারা সন্তান প্রসবের ঠিক এক মাসের মাথায় তাকে গীর্জায় নিয়ে যায়। এছাড়া ঐতিহ্যগতভাবে তারা কবুতর উড়ানো অথবা মুরগীর বাচ্চা নদীর তীরে রেখে আসে। যদি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে ঐতিহ্যগতভাবে একটি মুরগীর বাচ্চা নদীর তীরে রেখে আসে ও সাত গ্লাস মদ পান করে। আর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয় ঐতিহ্যগতভাবে দুটি মুরগীর বাচ্চা রেখে আসে এবং তিন গ্লাস মদ পান করে। অদ্যাবধি তাদের এই আচার ধর্মীয়ভাবে তাদের জন্ম সংক্রান্ত আচার হিসাবে পালন করে। এটি অনুসারে শিশু জন্মের পর সবাই মিষ্টি জাতীয় খাবার গ্রহন করে। এছাড়াও প্রত্যেক বছর জন্মদিন উৎসব পালন করে থাকে।

বয়সন্ধিঃকাল সংক্রান্ত

বোম সমাজে মেয়েদের বয়সন্ধিঃকালকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। বোম মেয়েরা সাধারনত ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে প্রথম ঋতুবতী হয়। তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা করা হয় না, তবে আত্নীয়ারা জ্ঞাত থাকেন।

বিবাহ

বোম সমাজে বিবাহ হচ্ছে আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কারণ সমাজের এ ধরনের অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহন করে। বোম সমাজের সর্বস্বীকৃত ও জনপ্রিয় বিবাহ পদ্ধতি হচ্ছে আত্নীয়স্বজন কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ। এটি একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। তা হচ্ছে বোম সমাজে সন্তানদের বিয়ে দেয়া এবং করানো বাবা মায়ের দায়িত্ব। কারও ছেলের বিয়ের বয়স হলে সে প্রত্যক্ষভাবে তার বাবা মাকে না জানালেও পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অন্যজনের মাধ্যমে তার বাবা মাকে জানায়। তবে মা বাবা এবং অভিভাবকের মাধ্যমে ঠিক করা বিয়েতেও ছেলে-মেয়েদের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফুপাত অথবা মামাতো বোনকে বিয়ে করলে বোম যুবক সমাজে প্রশংসিত হয়। বম সমাজে বিবাহের বয়স কালের কোন সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। বয়োজেষ্ঠের আগে বয়োকনিষ্ঠের বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। বিয়ের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে দৈহিক সৌন্দর্য, দারিদ্র অথবা ধন সম্পদের দিকে খেয়াল করা হয় না। বম ভাষায় 'জুংথিয়া মমি' মানে শৈল্পিক গুনের অধিকারী কিনা সে বিষয়ে খেয়াল করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা হয়। পাত্রী নির্বাচনের প্রথম অবস্থাকে বোম ভাষায় বলে 'হেলহ' । পাত্র তার বন্ধুদের সহায়তায় পাত্রীর বাড়ী গিয়ে পাত্রীর সাথে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে পাত্র নিজেই মেয়ের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে। এভাবে পর পর তিনবার প্রেম নিবেদন করার পর মেয়েটি রাজী হলে দু'জনে মিলে তাদের বৈবাহিক জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টি অভিভাবককে অবহিত করে তারপর পর্যায় ক্রমে কনের বাড়ীতে রেল পালাই (একের অধিক ঘটক নিযুক্ত করা) এবং রেলআন (ঘটক খাওয়ানো), মাণ (পণ) নির্ণয় করা এবং বিবাহের দিন স্থির করা ইত্যাদি পর্ব শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষের অভিভাবকের মধ্যে যাবতীয় পণ নিয়ে মৌখিকভাবে চুক্তি অথবা শর্ত সম্পাদন করা হয় । এদের ভাষায় এটিকে বলা হয় 'ইনকাইসিয়াহ্'। ঘটকালীর দিন হিসেবে বুধবার শুভ হিসেবে বিবেচিত হয় (রউফ, পৃ ৮৫, ২০০৪)। বোম সমাজে কনেপণ প্রথা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পণের প্রাধান্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় । বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সমস্ত পণ একসঙ্গে কনে পক্ষকে দিয়ে আসতে হয়। কনের জন্য বর পক্ষ থেকে পাওয়া সমুদয় পণ সামগ্রী কনের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। যেমনঃ রোয়াংমান, নোমান, পোমান , পানান, টামান, টাঠুয়াত, নিমান, আরত্লেইহ, মানপিয়া ইত্যাদি হল কনের মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এবং ঘটকদের মাঝে নিয়ম অনুযায়ী এবং প্রথানুযায়ী কনের জন্য পাওয়া পণ সমূহ ভাগ করার নাম (রউফ, পৃ ৮৫, ২০০৪)। নানা রকম নিয়ম কানুন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে কনে নিয়ে বর পক্ষ বাড়ীতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি ছুড়ে নববধুর আগমন বার্তা জানানো হয় । তখন সম্পূর্ণ গ্রামের সবাই আনন্দে মেতে উঠে। তারপর পানাহার আর বিভিন্ন আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে বধূবরন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে বোম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষীত হওয়াতে এ ধর্মমতে পাত্রপাত্রী আত্মীয়স্বজন সহ গীর্জায় গিয়ে আংটি বদলের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদন করে।

মৃত্যু

মৃত্য অনিবার্য সত্য। পৃথিবীর সকল সমাজেই যেমন মানুষের জন্ম রয়েছে তেমনি মৃত্যুও অনস্বীকার্য সত্য। মানুষের জীবনের সর্বশেষ আচার অনুষ্ঠান হয় তার মৃত্যুকে ঘিরে। বোম গ্রামে কেউ মারা গেলে সেই গ্রামবাসীরা সবাই মিলে মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করে। মরদেহ ঘরের মেঝেতে রাখা হয়। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনরা জড়ো হওয়ার পর মৃতের সৎকার করা হয়। যতদিন পর্যন্ত সৎকার কার্য শেষ না হয় ততদিন রাতদিন ধর্মীয় গান গাওয়া হয়। বোম সমাজে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তিকে পরিস্কারভাবে গোসল করানোর পর নতুন কাপড় পড়ানো হয় । মৃত ব্যক্তির মুখে বিভিন্ন রংয়ের দ্বারা চিত্রাংকন করা হয়। মৃত ব্যক্তির মাথার সামনে একটি পালক রাখা হয়। আত্মীয় স্বজনরা খাবার দাবারের আয়োজন করে। মৃত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকেও খাবার দেয়া হয়। কারন তারা বিশ্বাস করে দেহ মরে যেতে পারে কিন্তু আত্মা সব সময়ই জীবিত। এই আত্মা তার দেহে যখন আবার ফিরে আসবে তখন সে জীবিত হয়ে যাবে। বিধবা মহিলারা স্বামীর মৃতদেহের পাশে ২৪ ঘন্টা থাকতে পারে। এই আচার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মৃতদেহকে কবরস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কবরস্থ করার সময় মৃতদেহের সাথে বস্ত্রম, পানির বোতল দিয়ে দেয়া হয়। যদিও বর্তমানে বোম সমাজে তত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় না। মৃত্যুর পর মৃতদেহকে গোসল করিয়ে সরাসরি গোরস্থানে নিয়ে কবর দিয়ে দেয়া হয়। বোম গ্রামগুলোতে নির্ধারিত কবরস্থান রয়েছে। অধ্যয়নকৃত এলাকায় নিধারিত একটি কবরস্থান রয়েছে যা অত্যন্ত সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত। এতে মনে হয় বোমরা মৃতদেহ সৎকার করার জন্য তাদের গ্রামগুলোতে সুনির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে রেখেছে যা বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মত।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম সংগঠন

ধর্ম ও ধর্মীয়উৎসব

ধর্ম একটি সার্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ অর্থাৎ সকল সমাজেই কোন না কোন আকারে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের উপস্থিতি রয়েছে। মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে ধর্মের বিচিত্র রূপ লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম একাধিক, তাদের রূপ প্রকৃতি ও বিভিন্ন। ধর্মের সঙ্গে হৃদয় ও বিশ্বাসের যোগসূত্র নিবিড়। ধর্ম মানুষের কাছে জীবজগতকে বোধগম্য ও অর্থময় করে তোলে। এটি সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদ্যমান। বোম নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্ম রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব আচার ও প্রথা। বোমরা সর্বপ্রানাবাদে বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন আত্মারূপীয় সত্তায় বিশ্বাস করে। এই আত্মারুপীয় সত্তা গুলো হচ্ছে বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত অশরীরী সত্তা ভূত-প্রেত, দেব-দেবী, ঈশ্বর প্রভৃতি। বোমদের মধ্যে আত্মার ধারণার সম্প্রসারিত রূপই ধারাবাহিকভাবে ভূত-প্রেত, দেব-দেবী প্রভৃতির ধারণা ও সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। জড়োউপাসক বোম নৃগোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তার নাম 'খোজিং পাথিয়ান'। পৃথিবীর পশ্চিম অংশে এদের সৃষ্টিকর্তা পাথিয়ান অবস্থান করেন বলে এরা বিশ্বাস করে। অস্তমিত সূর্য ভগবান পাথিয়ানের ঘরে ঠাঁই নেয় বলে এদের দৃঢ় বিশ্বাস। এদের ধর্ম বিশ্বাসে 'হোয়াই' দেবতার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এরা বিশ্বাস করে যে স্থানে এ দেবতা অবস্থান করে সে স্থান জুম চাষের জন্য অনুপযোগী। 'খোজিং' হল বম সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতার নাম। খোজিং এর নামে পূজা দিয়ে থাকে। জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল বোম সম্প্রদায় জুম অর্জিত ফসল খোজিং এর কৃপায় লাভ করে বলে মনে করে। খোজিং পূজা শ্রাবন মাসে জুম চাষের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয় (রউফ, পৃ-৮১,২০০৪)। বোমরা এই অশরীরী আত্মা তথা দেবদেবীদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। বোমরা তাদের ঈশ্বরকে বলে "খাওমিং"। তারা তাদের সকল শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রার্থনা, পূজা সবকিছুই 'খাওমিং'কে উদ্দেশ্য করে পালন করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে 'খাওমিং' মৃত ব্যক্তির আত্মা অন্য আরেকটি নতুন শরীরে প্রবেশ করাতে পারে। আরও এক দেবতার নাম 'কার্নবুল'। তারা এই দেবতাকে সম্মান প্রদর্শন করে একটি মুরগীকে হত্যা করার মাধ্যমে। তারা বিশ্বাস করে দুষ্ট আত্মা কিংবা প্রেতাত্মারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা অতি প্রাকৃতে বিশ্বাসী ছিল এবং বৃক্ষ, নদী, গুহা ইত্যাদির পূজা করত। পশু বলি দেয়াকে তারা

Dhaka University Institutional Repository

ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, দুষ্টাত্মা হতে দ্রুতমুক্তি লাভ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে। বর্তমানে বোম আদিবাসীরা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী । বোমরা ১৯১৮ সন হতেই খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী হতে থাকে। Edwin Row lands নামক একজন মিশনারী সর্বপ্রথমে বোমদের মাঝে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে Pastor Patlaia, Saifunga নামক মিশনারীরা ভারতের মিজোরাম হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করে। তাঁর মধ্যে বোম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো ছিল।পরবর্তীতে তারা নিজেদের মধ্যে এই ধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। ১৯২৮ সালের সর্বপ্রথম বোম অধ্যুষিত চালান জিপাই গ্রামে খ্রীষ্টানদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। (Loncheu's, p-৩,২০০৩) বর্তমানে আনুমানিক ৯৭% বোম খ্রীষ্টান। তারা খ্রীষ্টান ধর্মের সকল উৎসব পালন করে থাকে। বর্তমানে এইগুলোই তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। অধ্যয়নকৃত এলাকায় বোমদের মধ্যে নিম্নোক্ত ধর্মীয় উৎসব লক্ষ্য করা গিয়াছে।

বড়দিন

এটি সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রত্যেক বছরের ২৫শে ডিসেম্বর হচ্ছে তাদের বড়দিন। বড়দিনের এক দিন পূর্ব হতেই তারা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। তারা নতুন পোশাক পরিধান করে, বাড়ীতে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করে। এছাড়া এই দিনে তারা গীর্জায় প্রার্থনা করতে যায়। গৃহে অতিথি সমাগম হয়।

শুভ শুক্রবারঃ

এদিনটিকে তারা 'গুডফ্রাইডে' বলে। বোমদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। তারা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুকে স্মরণ করে এদিনে গীর্জায় প্রার্থনা করে। এটি এপ্রিল মাসের প্রথম শুক্রবারে পালন করা হয়।

ইষ্টার সানডে

বোমরা এই দিনটিকেও ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য্যের সাথে পালন করে। তারা এই দিনটিকে যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় জন্মদিন বলে মনে করে। খুব উৎসব মুখর ভাবে তারা এদিনটি উদযাপন করে। এটি এপ্রিল মাসের প্রথম শুক্রবারের পরবর্তী রবিবার পালন করা হয়।

এছাড়াও ৩১শে ডিসেম্বর রাতে বর্ষ বিদায় উপলক্ষ্যে তাদের গীর্জা গুলোতে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় বর্তমান বোম সমাজে শুধু ধর্ম বিশ্বাসে নয় পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতিতেও পরিবর্তন এসেছে।

প্রচলিত আচার ও বিশ্বাস

রহস্যে ঘেরা মানুষ,মানুষকে কেন্দ্র করে মানব সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যময় মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে- আচার ও বিশ্বাস, যা মানুষের অতীতের ধারাবাহিকতার যোগসূত্র তৈরী

Dhaka University Institutional Repository

করে বর্তমানের ক্ষেত্রে বর্তমানকে বুনন করে আগামী প্রজন্মের অবস্থান সৃষ্টি করে। সাধারণত সেসব ধর্মীয় কাহিনীকে বোঝায় যেগুলোতে রয়েছে বিশ্বজগত ও এর বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি সংক্রান্ত বৃত্তান্ত। প্রতিটি সমাজেই এ ধরনের পৌরানিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। "কিভাবে জগতের সৃষ্টি হল, কিভাবে বিভিন্ন আচার প্রথার উৎপত্তি ঘটল ইত্যাদি। সাধারণত এ সকল কাহিনীতে দেবদেবী বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী চরিত্রদের কর্মকান্ডের বিবরন থাকে। এগুলোতে সমাজের মানুষদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিফলনও থাকে। বোমসমাজে এমন বেশকিছু পৌরানিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বোমদের মধ্যে বহু কাল ধরে একটি বঞ্চনার গল্প রয়েছে। কেউ জানেনা এ গল্পটি প্রথম কে শুনিয়েছিলেন। বোমদের দেবতার নাম 'খোজিং পাথিয়ান'। তিনি সৃষ্টিকর্তা। একদিন দেবতার ইচ্ছে হলো তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করবেন। দেবতা ডেকে পাঠালেন তার দুই ছেলেকে। স্থির হলো সৃষ্টির কাজ করবে দুই ছেলে। শর্ত জুড়ে দেয়া হল যে ছেলে সৃষ্টির কাজ প্রথমে শেষ করতে পারবে সেই হবে পরবর্তী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। দুই ছেলেকে পাঠানো হলো দিগন্তের দুই প্রান্তে। মাঝখানে একটি বৃক্ষে ঝুলানো হলো একটি ঢোল। সৃষ্টির কাজ শেষ করে যে প্রথমে ঢোল বাজাতে পারবে সেই হবে বিজয়ী। দুই ভাই চলে গেলো দুই প্রান্তে। সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে গেছে। সূর্য-চন্দ্র-সমুদ্র-নদী-নগর-বন্দর-হাট-বাজার-গ্রাম সমস্তই সৃষ্টি হতে লাগলো। দুই ভাই চমৎকার হাতে সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। সে যুগে শঠতা, প্রতারণা জানতোনা কেউ। কিন্তু হঠাৎ করে ঢোলের আওয়াজ শোনা গেল। এক ভাই দেখে তার কাজ এখনো অনেক বাকি। অন্য ভাইটিও মনে করে সে বুঝি দেরি করে ফেলেছে। অবশেষে হাতে পায়ে লেগে থাকা কাদামাটি ছেড়ে ছুড়ে ফেলে তারা দৌড়ে এল ঢোলের কাছে। একই সময়ে পৌছালো দুই ভাই। ঢোল বাজিয়েছিল শয়তান বা দুষ্ট লোক। দেবতা তাদের আবার পাঠালেন সৃষ্টির বাকী কাজ করতে। কিন্তু ততক্ষনে তাদেরই সৃষ্টি করা সূর্যের রোদ উঠেছে পৃথিবীতে। তাদের ফেলে আসা নরম কাদামাটি শক্ত হয়ে গেছে। তাদের সেই শক্ত মাটি দিয়ে টিলা পাহাড় পর্বত সৃষ্টি হয়েছে। দেবতা এই পাহাড় পর্বতমালাকেই বমদের জন্য দিলেন। সেজন্যই আজও পাহাড়ে পাহাড়েই তাদের আবাসভূমি।

সৃষ্টির আদি রহস্য নিয়ে আরও একটি কাহিনী হচ্ছে, তাংরুপা নামে এদের এক মহা শক্তিশালী পূর্ব পুরুষ ছিলেন। তার অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে সৃষ্টিকর্তা পাথিয়ান তার নিজ কন্যাকে তাংরুপার সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় তাংরুপার বাড়ী থেকে ভগবানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা তৈরীতে যারা কায়িক শ্রম

Dhaka University Institutional Repository

দেয়নি, তারা সৃষ্টি কর্তার পাথিয়ানের অভিশাপে উই পোকায় পরিণত হয় (দ্রং, পৃ ২০০,২০০১)। বোমরা বিশ্বাস করে, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সমস্ত পশু-পাখী, কীটপতঙ্গ সবাই কথা বলতে পারতো। ফলে এদেরকে শিকার করতে গেলে মানুষকে বিপাকে পড়তে হতো। কারণ পোকা-মাকড়, জীব-জন্তু, পশু-পাখীর কান্নাকাটি, অনুনয় বিনয়ের জন্য মানুষদের পক্ষে এদের শিকার করা সম্ভব হতো না। আর এজন্য মানুষকে খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে হতো। তখন তাংরুপার স্ত্রী তার বাবা ভগবান পাথিয়ানের কাছে আবেদন জানান যে, তিনি যেন পশু-পাখী, কীটপতঙ্গের মুখের ভাষা কেড়ে নেন। তখন থেকেই পশুপাখীর মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (প্রাগুক্ত, পৃ ২০০,২০০১)।

অধ্যয়নকৃত এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে যে, বোম গ্রামগুলোতে ছোট পাখির কিচির মিচির শুনতে পাওয়া খুবই ভাগ্যের । পাখিরাও যেন তাদের জাত শত্রুকে চেনে। অন্য কোন জাতের মানুষ এলে নির্বিকার অকুতোভয় পাখিটি বসে ডালে, যেই বোম মানুষটা ঐ পথে যায় পাখিটা পাছা নামিয়ে অন্যদের বিপদ সংকেত জানিয়ে দেয় উড়াল (মাঠকর্ম থেকে সংগৃহীত)।

বোম সমাজে মানুষ বিশ্বাস করে যদি কেউ শপথ ভঙ্গ করে তবে তার চোখে এবং শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি বংশানুক্রমিক ভাবে তার পরবর্তী বংশধরদের মাঝেও কেউ পাগল হয়ে যেতে পারে। এরূপ ধারনার বশবর্তী হয়ে সাধারনত তারা কেউ শপথ ভঙ্গ করে না (মাঠকর্ম থেকে সংগৃহীত)।

এক কালে বোমদের মধ্যে জীববলি প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করতো যে ব্যাক্তি জীব বলি দেয় তার মধ্যে আত্মাবত্ত প্রবেশ করে তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। যদি জুম ক্ষেত্রে বলি দেয়া হয় তাহলে জুম উর্বরতা বৃদ্ধি পায় (মাঠকর্ম থেকে সংগৃহীত)।

বোমরা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর লোকেরা মিথিথোয়া বা মৃতের দেশে চলে যায় এবং সেখানে নতুনভাবে জীবনযাপন করে। ইহলোকে অর্জিত সকল ধনরত্ন, দাস-দাসী তারা পুনরায় সেখানে ফিরে পায়। তারা ফকির, সন্ন্যাসী জাতীয় লোকদের 'খোয়াভাং' বলতো এবং তাদের বিশ্বাসে ছিল বনের বাঘ খোয়াভাং এর পালিত পশু। তারা আরও বিশ্বাস করতো বাঘ কখনো মানুষের ক্ষতি করে না। (সুগত, পৃ ২, ১৯৯৫)।

এরকম আরো অনেক পৌরানিক কাহিনী বোম সমাজে প্রচলিত আছে। মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসা বম সমাজের লোকগণ ধর্মভীরু ও ধর্মভাবাপন্ন। বোম সম্প্রদায় এগুলোকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করে। তবে বর্তমানে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে অনেক শিক্ষিত বোম পরিবার অতীত ইতিহাস হিসাবে এসকল

Dhaka University Institutional Repository

পৌরনিক কাহিনী বর্ণনা করে থাকে। তবে এগুলো ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে আগামী প্রজন্মের কাছে তাদের ইতিহাস হয়ে যাবে রহস্যাবৃত।

যাদু বিদ্যা

সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাদুবিদ্যা। এটিকে তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমাজেই এ সকল কিছুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সাধারনভাবে যাদু বিদ্যা হচ্ছে এমন একটি কৌশল যা দিয়ে কোন অলৌকিক উপায়ে কোন কিছুকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। নৃবিজ্ঞানী জেমস ফ্রেজার তাঁর The Golden Bough (১৯২৯) গ্রন্থে বলেন 'যাদু বিদ্যা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের নকল বা কৃত্রিম ব্যবস্থা যা মানবীয় ব্যবহারের একটি ভ্রান্ত পথনির্দেশিকা'। বোম সমাজে যাদু বিদ্যার প্রচলন ব্যাপকভাবে রয়েছে তারা মনে করে যাদু মন্ত্রে রয়েছে ঐন্দ্রজালিক শক্তি যা প্রয়োগ করে সফলকাম বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়। আর যে ব্যক্তি, যা মহিলা এ ধরনের অতিন্দ্রিয় শক্তি আয়ত্ব করতে পারে তারা সিদ্ধ পুরুষ কিংবা সিদ্ধ মহিলা হিসাবে বিবেচিত হয়।জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের এমন কোন বস্তু নেই যেখানে যাদু মন্ত্রের প্রয়োজন না আছে। তারা রোগ-জরা,জন্ম মৃত্যু কালীন অবস্থা, ফসল উৎপন্ন, প্রেম বিরহ, ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই যাদুবিদ্যার প্রয়োগ অপরিহার্য বলে মনে করে।যাদু বিদ্যা প্রয়োগের বিষয়বস্তুর মধ্যে গাছের শিকড়, লতাপাতা, পাখীর পালক, মেয়েদের চুল ও নখ, গায়ের ময়লা, পরিধানের কাপড়ের আচল, ধুলো, ঋতু স্রাবের কাপড়, বীট, তেল, সিঁদুর, পানসুপারী ইত্যাদি জিনিস। এসকল বস্তুতে মন্ত্র পড়ে ঝাড় ফুক দিয়ে কতকগুলো নিয়মের মাধ্যমে তা পালন করলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই সকল বিষয় তারা রোগ ব্যাধির নিরাময়েও প্রয়োগ করে থাকে। তারা বিশ্বাস করে এই যাদুবিদ্যার বিশ্বাস নিজের মধ্যে এনে তা রোগের মধ্যে প্রয়োগ করলে অশুভ লক্ষন বিদূরিত হবে এবং রোগ নিরাময় হবে। বর্তমান অধ্যয়নকৃত এলাকায় লাইমিপাড়গ্রাম এবং ফারুকপাড়গ্রামে বিভিন্ন সময়ে বোম অধিবাসীদের মধ্যে যাদু বিদ্যার প্রতি অবিচল বিশ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও বোম সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারনার প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

বোন সমাজের অনগ্রসরতাএবং উন্নয়ন

আদিবাসী হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যারা মুটোমুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করেন যে তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অর্ন্তভূক্ত। আদিবাসীর সংজ্ঞা নিয়ে বিদ্যমান সাহিত্যে নানা মতপার্থক্য আছে। শাব্দিক অর্থে আদিবাসী বলতে এমন এক ধরনের জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের পূর্ব-পুরুষগণ সেই ভূমির আদিম বাসিন্দা ছিল। কাজেই আদিবাসী ও 'আদিম অধিবাসী' কথা দু'টি সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত আদিম দৃঢ়মূল জনসত্তা ও জীবনধারা কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহমান থাকলে তাদের নামে অভিহিত করা যায়। আবার আদিবাসী বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যারা সদস্যরা মনে করেন যে তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভূক্ত। এখানে মূলত সংস্কৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, কেননা সমজাতীয় সংস্কৃতিই আদিবাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, এরা হচ্ছেন এক-একটি সাংস্কৃতিক একক।

বাংলাদেশে আইন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আদিবাসীর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছে। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' ১৯৫৭ সালে Indigenous and Tribal Populations Convention ১০৭ নং গ্রহন করে। উক্ত কনভেনশন অনুযায়ী আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবিকাশের বৃদ্ধি সাধন এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো দায়িত্ব পালন করবে। এ কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে সংহতিকরণের ব্যাপারে সহায়তা করা। কিন্তু দেখা যায় যে, আদিবাসীদের সংহতিকরণ বিষয়টি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংহতিকরণ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গীভূতকরণ হিসেবে প্রয়োগ হতে থাকে। ফলে সম্পদের উপর আদিবাসীদের চিরাচরিত/প্রথাগত অধিকারকে অস্বীকার করা হয় এবং ভৌগলিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

465270

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে এ কনভেনশনের পরিবর্ধনে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' ১৯৮৯ সালে Indigenous and Tribal Populations Convention ১৬৯ নং কনভেনশনে আদিবাসীর সংজ্ঞা প্রদান করে। সংজ্ঞায় আদিবাসী বলতে-জাতীয় মূল স্রোতধারার সাথে সংহতিকরণের পরিবর্তে আদিবাসীদের স্বকীয় জীবনচর্চা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সত্তা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার স্বীকৃতি দেয়া হয়। অতএব 'আদিবাসী' গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাও প্রদান করা হয়। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালায় যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারায় দুর্ভোগের কবলে পড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সমর্থ হয় না এবং যাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন ও মুনাফা নেয়ার সামর্থ্য থাকে না এমন সব দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘের বিবেচনায় যারা নিজেদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত করতে চায়-যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্য অংশ থেকে পৃথক এবং যাদের সামাজিক মর্যাদা সম্পূর্ন কিংবা আংশিকভাবে নিজেদের রীতিনীতি বা প্রথা অথবা বিধি দ্বারা নিয়েন্ত্রিত তারাই আদিবাসী। তারা এমন জনগোষ্ঠী, যারা নির্দিষ্ট এলাকা বা ভূ-খন্ডে বিজয়াভিযান, উপনিবেশকরণ অথবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা প্রতিষ্ঠাকরণের আগে থেকেই বসবাস করে আসছে এবং যাদের আইন-মর্যাদা যাই হোক না কেন নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ আংশিক সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

এই সংজ্ঞাগুলো হতে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য সমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) কোনো ভূ-খন্ডের প্রথম বসবাসকারী মূল আদিবাসীদের বংশধর হিসেবে আদিবাসীদের চিহ্নিত করা চলে;

(২) বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠীর আগ্রাসন তারা অপ্রধান/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রূপান্ত রিত এবং পরাধীন অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে;

(৩) তারা এখনো নিজেদের বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও ভাবধারাকে মেনে চলে এবং তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখন্ড ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ;

Dhaka University Institutional Repository

(৪) অন্যকোনো সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের লোকেরা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আদিবাসীরা বর্তমানে বসবাসকারী ভূখন্ডে সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে বসবাস করতো এবং ঐ ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ছিল ও সেই সম্পদ ভোগ দখল করতো;

(৫) তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রভূত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং এর ফলে তাদেরকে সংখ্যা গুরু প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়;

(৬) তারা রাষ্ট্র ও সংখ্যাগুরু প্রভুত্বকারী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে অধীনস্থের ভূমিকায় থাকতে বাধ্য হয় এবং তারা সাধারণত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভেদের শিকার হয়।

এক কথায় আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুসারে ঔপনিবেশিকতার শিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যাদের সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায় ও যাদের স্বকীয় নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ধরে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তাদেরকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তর্জাতিকভাবে আদিবাসী বলতে যাদের বোঝানো হয়েছে তারা হলো সে-সকল জনগোষ্ঠী তথাকথিত সভ্যতার শিকার হয়ে রাষ্ট্রের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে এবং যাদের উপজাতি, আদিম ইত্যাদি বিদ্বেষমূলক আখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আদিবাসী বলে যারা দাবী করছে তাদের সম্পর্কে বর্তমান সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এতে বলা হয় যে বাংলাদেশে আদিবাসী বলে কেউ নেই। কারন যারা নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবী করছে তারা সবাই কোন-কোনভাবে ইতিহাসের কালক্রমে বাংলাদেশে স্থানান্তরিত বা অভিবাসন করেছে। যার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে। অতএব এরা বাংলাদেশে জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্র এবং এধরনের অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। যাদের সংস্কৃতি ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময়। এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি হিসাবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক ও সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। এই ব্যাখ্যাটিকে সুস্পষ্ট করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ২৬শে জুলাই ২০১১ইং তারিখে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। তাতে গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মুখে সরকার তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন এ নিয়ে আর যেন বিতর্কের সৃষ্টি না করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে তারা কেউ আদিবাসী নহে।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

সারাবিশ্বে আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্যের প্রত্যক্ষ শিকার হতে রক্ষার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালকে 'International Year of the World's Indigenous People' ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যে জাতিসংঘ বলেছে, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই আদিবাসীরা বহুমুখী শোষণ ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয় আদিবাসীরা হয়েছে উন্নয়নের নামে ধ্বংসের মুখোমুখি। বাঁধ, সংরক্ষিত এলাকা, পার্ক, ইকোট্যুরিজম, সামাজিক বনায়ন, মিলিটারি বেস, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এসব নানা প্রকল্পের দ্বারা আদিবাসীরা উন্নয়ন তো হয়নি, বরং তারা হয়েছে এসব কারণে উচ্ছেদের শিকার। তাদের গ্রাম, বসতভিটা, ফসলের ক্ষেত্র, বিচরণভূমি-সব তারা হারিয়েছে, আর অসহায়ের মতো মূলধারার মানুষের 'উন্নয়ন তান্ডব' তারা দেখেছে। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের বঞ্চনার সংঙ্গে উপরিল্লিখিত কারণসমূহের যথেষ্টই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। (১০১, ২০১৮, রহমান)

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক

১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৪৯/২১৪ রেজুলেশনের মাধ্যমে ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে গ্রহন করে। আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এ দিবস ঘোষণা করা হয় এবং আদিবাসীদের ইস্যুতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, বেসরকারি সংগঠন ও অন্যান্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শুধু তাই নয়, আদিবাসীদের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বের আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুখোমুখি হয়ে থাকেন, সেসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিও জন্য জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়কে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের মূলসুর হলো-'আদিবাসী জনগণ: কর্মে অংশীদারিত্ব' (Indigenous People: Partnership in Action)। প্রথম আদিবাসী দশকের মধ্যে আদিবাসীদের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় আবার গত ১ জানুয়ারি ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়কে জাতিসংঘ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক এবং ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষনা করে যাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব ও মর্যাদার উন্নয়নের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। (১০২, ২০১৮, রহমান)

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের আরেকটি অন্যতম সফলতা হলোঃ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ২০০০ সালে আদিবাসীদের জন্য স্থায়ী আদিবাসী বিষয়ক ফোরাম গঠিত হয়। ২৯ জুন ২০০৬ জাতিসংঘের নবগঠিত মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক আদিবাসী অধিকার বিষয়ক খসড়া ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এর ফলে ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। সুখবর হলো-জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র সাধারণ পরিষদে বিগত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘ সদস্যরাষ্ট্রের ১৪৩টি দেশ এ ঘোষণাপত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে ৪টি দেশ (কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র) বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আর ভোটদানে বিরত ছিল ১১টি দেশ যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় সরকারের আদিবাসীদের প্রতি মনোভাব। বাংলাদেশ যেমনি নিজের আদিবাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারেনি, তেমনি সারা বিশ্বের বিপন্ন আদিবাসীদের প্রতিও সম্মান দেখাতে পারেনি। যদিও ঘোষণাপত্রের আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তবুও বাংলাদেশের 'বিরত' থাকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে মানবাধিকার সংক্রান্ত স্বতন্ত্র দলিলে স্বাক্ষর না করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীয় ভাবমূর্তি খুন্ন করেছে। (১০২, ২০১০, [illegible])

অনাদিকালথেকে বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫টি। এছাড়া আরও ক্ষুদ্র সম্প্রদায় রয়েছে বলে নৃবিজ্ঞানীদের ধারনা। অবশ্য সরকারী আদম শুমারী বা আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন।

বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রদান করা হল-

১।	আসাম	-	Asam	২৪।	ম্রো	-	Mru
২।	বোম	-	Bawm	২৫।	মনিপুরী	-	Monipuri
৩।	বানাঁ	-	Banai	২৬।	মাহাতো	-	Mahato
৪।	বেদীয়া	-	Bediya	২৭।	মুন্ডা	-	Munda
৫।	ভূমিজ	-	Bhumij	২৮।	মালো	-	Malo
৬।	বাগদি	-	Bagdi	২৯।	মাহালী	-	Mahali
৭।	চাকমা	-	Chakma	৩০।	মৌরিয়ার	-	Muriyar
৮।	চাক	-	Chak	৩১।	মৌসহর	-	Musohor

Dhaka University Institutional Repository

৯।	দালু	-	Dalu	৩২।	উড়িয়ান	-	Oraon
১০।	গারো	-	Garo	৩৩।	পাংখো	-	Pangkhu
১১।	গুড়খা	-	Gurkha	৩৪।	পাহাড়িয়া	-	Paharia
১২।	হাজং	-	Hajong	৩৫।	পাহান	-	Pahan
১৩।	খাসি	-	Khasi	৩৬।	পারটো	-	Parto
১৪।	খাড়িয়	-	Kharia	৩৭।	রাখাইন	-	Rakhain
১৫।	খেয়াং	-	Khayang	৩৮।	রাজওর	-	Rajuar
১৬।	খুমী	-	Khumi	৩৯।	রাই	-	Rai
১৭।	কোচ	-	Koch	৪০।	রাজবংশী	-	Rajbongshi
১৮।	কুলি	-	Kole	৪১।	সাঁওতাল	-	Santal
১৯।	কর্মকার	-	Karmakar	৪২।	সিং	-	Shing
২০।	ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মন	-	Khatriya Barman	৪৩।	তনচংঙ্গা	-	Tangchangya
২১।	খন্দ	-	Khondo	৪৪।	ত্রিপুরা	-	Tripura
২২।	লুসাই	-	Lusai	৪৫।	তুরী	-	Turi
২৩।	মারমা	-	Marma				

(Solidarity-২০০৩)

বর্তমানে অধ্যয়নকৃত বোম সমাজের পশ্চাৎপদতা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ও তাদের সরাসরি অংশ গ্রহন এর উপলব্ধি ও মানবিক বোধ থেকে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

শিক্ষা

'সবার জন্য শিক্ষা'- এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিগতভাবে স্বীকৃত। সেজন্য সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রতিটি পাড়ায় বা গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এখানকার শিশুরা শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। কারণ গভীর অরণ্যযুক্ত সুউচ্চ পাহাড় চার পাঁচটা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য

বান্দরবান জেলার একটি সরকারী সদর হাসপাতাল, বসবাসরত জনগোষ্ঠীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়াও বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে অবস্থিত পাড়া বা গ্রাম সমূহের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে পাড়া বা গ্রাম থেকে হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে সময় লাগে ২-৩ দিন। এছাড়াও নিজ নিজ থানা সদরে রোগী নিয়ে যাওয়ার সহজ সাধ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাও নেই। ফলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিলে বছর যোগাযোগ এর জন্য বহুরোগী প্রতি বছর বিনা চিকিৎসায় গৃহেই মৃত্যুবরন করছে।

খাদ্য সামগ্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদী গুলোর উজান এলাকায় সমতল ভূমি কম, উচু বনভূমি বেশী এবং সেখানকার পাড়াবাসী বা গ্রামবাসী সকলকেই জুম চাষ করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় ফলে সকল পরিবারকে জুমিয়া পরিবার হিসাবে নামকরণ করা হয়। জুম চাষের উৎপাদনী শক্তি ক্রমহ্রাসমানের প্রেক্ষিতে পরিবারগুলোর খাদ্য সংকট তেমনি আর্থিক অবস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্রসীমার নীচে। ঝুম চাষ করছে ঠিকই কিন্তু বাৎসরিক খাদ্য মজুদ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে খাদ্যাভাবে বর্ষাকালে বাঁশ কোরুল (কচি বাঁশ চারা) এবং শুষ্ক মৌসুমে জঙ্গলী আলু খেয়ে পরিবারকে জীবন ধারন করতে হচ্ছে। ঐ সকল এলাকার আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের আয় ক্ষমতা না থাকায় অনেক সময় গোটা পরিবারকেও অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হচ্ছে।

উৎপাদন ব্যবস্থা

ঐতিহ্যবাহী জুম চাষের বিকল্প হিসেবে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উদ্যান উন্নয়ন, বনায়ন, বৃক্ষরোপন, মৎস্যচাষ, কুটির শিল্প, বয়নশিল্প, হাঁস-মুরগী পালন, কারিগরী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পেশাকে গ্রহনের মাধ্যমে পার্বত্য জেলার জুমিয়াদেরকে আর্থিকভাবে পূনর্বাসিত করার প্রচেষ্টা চলছে। বমরা এর ব্যতিক্রম নয় তবে এ সমস্ত উদ্যোগ পরিপূর্নভাবে সমাজে প্রভাব ফেলতে পারেনি। যাইহোক এ প্রভাব বম সমাজকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাহায্য করছে। পাহাড়ী জুমিয়াদের আদিম জীবিকা যা বর্তমানে অলাভজনক, তা এখনও বর্জন করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ব্যবস্থা

বান্দরবান জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। স্থলে ও নৌপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। বান্দরবান জেলা সদর থেকে বিভিন্ন থানা কিংবা উপজেলায় যাওয়ার জন্য বাস ও জীপগাড়ী যা স্থানীয়ভাবে 'চাঁদের গাড়ী' নামক এক ধরনের গাড়ী রয়েছে। পাহাড়ী রাস্তা আঁকা-বাঁকা ও সরু হওয়ায় যানবাহন চালানো অনেকটা কষ্টকর। তেমনি ভাবে সাংগু নদী দিয়ে নৌকা চলাচালের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন হয়। ফলে কৃষিপন্য বাজারজাত করন, বিপনন ও ন্যায্য দাম আদায় এসব যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নয়নের কারণে সঠিকভাবে সম্ভবপর হয় না। কেউক্রাডং পাহাড় সংলগ্ন পাড়াগুলো থেকে বিপনন কিংবা ক্রয়ের উদ্দেশে রুমা বাজারে আসতে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয় কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে পায়ে হেটে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

বোমদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জাতিসত্তাকে সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য কোন ধরনের স্বীকৃত সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। যদিও বান্দরবানে 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে।

এছাড়াও বান্দবানের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থার কারণে সেখানকার সমাজগুলো আরও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তবে এ সমস্যা সমূহের সমাধানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সমাধান করতে হবে। যাতে প্রত্যেকটি নৃগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো এবং তাদের ঐতিহ্যগত ধ্যানধারনা, বিশ্বাসগুলো লালন পালনে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে বোম ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনের ভিত্তিতে সমাজের ধারা বাহিক অগ্রগতি বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা অনিবার্য। সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য রক্ষায় পরিবেশের পাশাপাশি দারিদ্র, দুরাবস্থা ও নিরক্ষরতা দুর করার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ও সঠিক সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী।

কেসষ্টাডি-১

লাল থাং রোয়ান বোম, বয়স-আনুমানিক ৩৫। তিনি ফারুক পাড়া গ্রামের অধিবাসী। পরিবারের সদস্য ৪ জন। তিনি এস.এস.সি পাশ। পেশাগত ভাবে ঐতিহ্যবাহী জুম চাষের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

জড়িত। তাঁর মতে, বোমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রকৃতির পূজা করতো। তবে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহনের পর তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। বোমদের উচ্চ শিক্ষিতের হার নগন্য। বর্তমানে তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। তিনি বিশ্বাস করেন, যদিও তারা বর্তমানে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত তবুও এখনো তারা ঐতিহ্যগত অতীত ধর্মের রীতিনীতি পালন করে থাকেন।

কেসষ্টাডি-২

জেমস বোম, বয়স আনুমানিক ৩২। বিবাহিত, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬জন। ফারুকপাড়া গ্রামে পিতমাতার সাথে বসবাস করেন। তিনি এস.এস.সি পাশ। মূল অর্থনৈতিক জীবিকা কৃষি ভিত্তিক জুম চাষ। পাশাপাশি সে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। গ্রামে তার একটি দোকান রয়েছে। এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে যখন বিভাগীয় শহরগুলোতে আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোতে তিনি তাঁদের নিজস্ব উৎপাদিত কাপড় বিক্রি করেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা সকলে খ্রীষ্টান। তবে তারা এখনো অতীত ধর্মের সকল নিয়ম কানুন পালন করেন।

কেসষ্টাডি-৩

রানী থাং বোম, বয়স আনুমানিক ২৩। বিবাহিত এবং ৩ সন্তানের জননী। পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫জন। লাইমিপাড়ায় বসবাস করেন। তিনি প্রাইমারী পাশ। জুম চাষের সময় স্বামীর সঙ্গে জুম ভূমিতে কাজ করেন। বিভিন্ন গৃহপালিত জীবজন্তু যেমনঃ মুরগী, শুকর পালন করেন এবং বাড়ীর সামনে সব্জি চাষ করেন যা পারিবারিক আয়ের উৎস। সকল কাজই তিনি এবং তাঁর স্বামী এক সঙ্গে করেন। তারা মনে করেন, খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহনের ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হিসাবে 'খোজিং পাথিয়ান' (জড়উপাসক বমদের সৃষ্টিকর্তা) কেই বিশ্বাস করেন এবং অতীত ধর্মের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলেন।

কেস স্টাডিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বোমদের জীবন যাত্রায় খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধর্মান্তরিত হলেও বোমরা তাদের ঐতিহ্য; কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বিশ্বাস, রীতি-ণীতি ও মূল্যবোধ সবকিছু অতীত জড়উপাসক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারা এখনও স্বতন্ত্র জাতিস্বত্ত্বাকে লালন করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। কেস স্টাডিগুলো পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় যে তাদের মধ্যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও তারা এখনও ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল যা বোম সমাজকে অন্যান্য নৃগোষ্ঠী ও বৃহত্তর সমাজ থেকে পৃথক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও নিজস্ব স্বকীয়তা বিকাশমান রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

উপসংহার

বোম নৃগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই অধ্যয়নটি 'বোম'দের জীবন যাত্রার একটি জাতিতাত্ত্বিক বা পূর্নাঙ্গ বর্ণনা যেখানে রয়েছে তাঁদের অতীত ইতিহাস, গোত্র ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, জুম চাষ ভিত্তিক অর্থনীতি, বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবন এবং ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক জীবন। ক্ষেত্র গবেষণা এবং গৌন উৎসের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা তথ্যের সমন্বয়ে গবেষণাটিতে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোম জনগোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষন করে তাদের পূর্নাঙ্গ বিশ্লেষন করা হয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা নকশাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- জরিপ পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতি। গবেষণাটি অনুসন্ধান এবং বর্ণনামূলক প্রকৃতির হওয়ায় গুণগত এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক উভয় ধরনের কৌশল সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সুগভীর পর্যবেক্ষন এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক তথ্য সমূহকে একক চলক এর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তালিকা বর্ণনা এবং অন্যান্য তথ্য যা এই গবেষণা থেকে পুনরুৎপাদিত হয়েছে তা মূলতঃ প্রাথমিক সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অংশগ্রহন পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমূহের উপর প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তু এবং উল্লেখযোগ্য অংশ। যেহেতু সামাজিক জীবন ভৌগলিক পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি বিষয় তাই সামগ্রিকভাবে বান্দরবানের ভৌগলিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বোম সমাজের প্রধান গোত্রসমূহ, তাদের বিবাহ ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং জ্ঞাতি সম্পর্কিত পদাবলী, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, আবাসগৃহ ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্বেও সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জুম ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন, পাশাপাশি অন্যান্য পেশার বিভিন্নতা এবং বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বর্তমানে বোমদের অবস্থান, বোমদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা যেখানে রয়েছে তাদের বাৎসরিক উৎসবাদি, জীবনের সন্ধিঃক্ষন সংক্রান্ত আচার ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কের বর্ণনা করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আদি ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থা, বর্তমান ধর্ম এবং ধর্মীয় উৎসবসমূহ, তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পৌরাণিকবিশ্বাস সমূহ এবং বর্তমান আধুনিকতার যুগেও যাদু বিদ্যার অস্তিত্ব। সর্বোপরি একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় সকল

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যসমূহ যা তাদের সমাজকে অন্যান্য সমাজ থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ করার পাশাপাশি বহিঃ ও অন্তস্থ উপাদান সমূহ যা তাদের সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তন ও সংমিশ্রণ করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করছে তার সকল কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে সাধারণত যে সকল সিদ্ধান্ত ও প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হলঃ

প্রথমতঃ বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠী বর্তমানে একটি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রভাব যেমন- খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব, নগরায়ন, শিল্পায়ন, শিক্ষাবিস্তার, রাজনৈতিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের সংস্পর্শের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যগত ধারনা দুটো দৃশ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বোম নৃগোষ্ঠী দৃশ্যত এবং কার্যত তাদের গোষ্ঠী, পরিবার, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি এবং বিশ্বাস হারাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে বোম জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী পরিচয় হারিয়ে বৃহত্তর সমাজ এর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ও সংমিশ্রণের ফলে ক্রমান্বয়ে একটি বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

চতুর্থতঃ বর্তমানে বোম জনগোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্রতাকে হারিয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পাশাপাশি গণমাধ্যম, নগর সংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনযাপনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

পঞ্চমতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তারা খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করলেও অধিকাংশ বোমরা তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও রীতিনীতিকে ধরে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বর্তমান বোম সমাজ তাদের ঐতিহ্য এবং পরিবর্তন এই দুই ধারায় মিলিত সুস্পষ্ট মিশ্রিত একটি নৃগোষ্ঠী। তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমানে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোজিত হচ্ছে। বিশেষত: বর্তমানে বান্দরবান জেলা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসায় তাদের উন্নয়নের দ্বারা উন্মোচিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং নাগরিক জীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে। যদিও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবেই প্রাথমিক অবস্থায় তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সূচিত হয় তথাপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ ও তাদের জীবন যাত্রায় শুভ পরিবর্তন সূচিত করছে। যা আবার নতুন অনুমান বা প্রকল্প নির্ধারনে সহায়তা করছে এবং নতুন বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের ক্ষেত্র সমূহ সৃষ্টি করছে। যা হোক পরিবর্তন গুলো যতই দৃশ্যমান হোক না কেন তারপরও বোম নৃগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব জাতিস্বত্ত্বা, স্বতন্ত্র ও পৃথক এবং ঐতিহ্যগত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাশীল যা তাদেরকে একটি পৃথক স্বজাত্যবোধে ও জাতিস্বত্ত্বায় পরিগণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী বই

Ahsan Selina 1993 : The Marmas of Bangadesh H.R.D.P. Winorek International

Ali, A. 1998 : Santals of Bangladesh, Institute of Social Research and Applied Anthropolgy, Midnapur, West Bengal

Bessaignet, P. 1958 : Tribesmen of Chittagong Hill Tracts, Dhaka.

Beteille, Andre 1966 : Caste, Class and Power, Oxford University Press, Bombay.

Chakma, S. 1985 : Bangladesher Upajati (Tribes of Bangladesh), Bangladesh Academy, Dhaka.

1993 : The Aborigine of Chittagong Hill Tracts and its Culture, Tribal Cultural Institute, Rangamati.

1998 : Parbatya Chattagramer Upajatiyo Bhasha, Tribal Cultural Institute, Rangamati.

Dhaka University Institutional Repository

2000 : Bangladesher Upajati O Adibashider Shamaj, Shanskrits O Acharbabohar, Nawroz kitabistan, Dhaka.

Chowdhury, A. 1978 : A Bangladesh Village; A Study of Social Stratification, CSS, and Dhaka University, Bangladesh.

Chakraborti M. and D. Mukherji 1971 : Indian Tribes (Calcutta: Saraswati Library)

Dalton E. T. 1882 : Desriptive Ethnology of Bengal (Indian studies, Calcutta)

Dalton E. T. 1978 : Tribal History of Eastern India (Cosmo Publication, New Delhi, India)

Fox R. 1983 : Kinship and Marriage: An Anthropological perspective, Cambridge University Press, London.

Gray, A. 1995 : Indigenous Peoples and the United Nations, The Declaration reaches the Commission on Human Rights, IWGIA, The Indigenous World.

Herskovits Melville J. 1940 : The Economic life of primitive people New York: Knopt

Dhaka University Institutional Repository

Heobel 1966 : Anthropology, The Study of Man: New York

Halim, S. 2003 : Solidarity 2003, Bangladesh Indigenous Peoples Forum, Dhaka.

Hosain, S. A. 1990 : Parbatya Chattogramer Upajati Shamsha O Sharkar, Bangladesh Asiatic Society, Dhaka.

Hutchinson, R. H. S. 1909 : Chittagong Hill Tracts, District gazetteer; Allahabad, Dehli.

1909 : Gazetter of the Chittagong Hill Tracts Districts, Vivek Publishing Company, Delhi.

1906 : An account of the Chittagong Hill Tracts, The Bengal Secretariats Book Depot, Calcutta.

Ishaq, M. 1971 : Chittagong Hill Tracts Districts Gazetter, Dhaka.

Jahangir, B.K. 1984 : Tribal Peasants in Transition: Chittagong Hill Tracts, Shah Qureshi, Institute of Bangladesh Studies.

Dhaka University Institutional Repository

Khan, F.R. 1969 : Principles of Sociology, Dhaka.

Kothari, C.R. 1985 : Research Methodology: Methods and Techniques. New Delhi.

Lewin, T.H. 1869 : The Tribes of Chittagong Hill Tracts and the Dwellers Therein, Calcutta Bengal Printing Ltd. India.

1870 : Wild Races of Southeastern India, London.

1869 : The Hill Tracts of Chittagong and The Dwellers Therein, Bengal Printing Company Ltd. Calcutta, India.

Lirkung, S. 2002 : An Introduction to the Bawm Society, Bawm Social Council Bangladesh, Bandarban.

Loncheu. S. 2003 : Bawka Rili (2),
Bawm Literature Forum, Dhaka.

McKenzie, A. 1884 : History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the Northeast Frontier of Bengal, Mittal Publications, Delhi, India.

Dhaka University Institutional Repository

Nagh, L. N. 1981 : Introductory of the Tribal Society, Bawm Social Council Bangladesh, Bandarban.

Pardo, S. L. 1998 : The Bawms; The Forest Wandering Tribe of Chittagong Hill Tracts, Rangamati.

Sharma N. L. 1984 : Parbatya Chattogram O Upajati, Kalpatoru, Chittagong.

Spradley J. P. 1980 : Participant Observation, USA Harcourt Brace Jovanovich college Publication, Orlando, Florida.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

আহ্মাদ, জাফর ১৯৯৩ : উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

এস, এ, প্রু ২০০১ : পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি।

এস, লনচেও ২০০৩ : প্রাথমিক বম ভাষা শিক্ষা।

এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক ১৯৭২ : পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নিউইয়র্ক।

কামাল, মেসবাহ, ইসলাম, জাহিদুল ২০০৭ : আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রহমতুল্লাহ, ২০১০ : ভাষা সমস্যা, বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ঢাকা

চৌধুরী, রশীদ, ১৯৯৫ : নৃবিজ্ঞান ঃ উদ্ভব বিকাশ ও গবেষনা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

দ্রং, সঞ্জীব, ২০০১ : বাংলাদেশে বিপন্ন আদিবাসী, ঢাকা।

বড়ুয়া, বাবুল ২০০১ : বাংলাদেশে আদিবাসী প্রবাদ প্রবচন, মাস্থু-পত্রিকা (৬ষ্ঠ সংস্করন) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, বান্দরবান।

বাতেন, আব্দুল ২০০৩ : বাংলাদেশে ম্রো উপজাতির জীবন ধারা, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

বার্টোসি পিটার জে, ১৯৭৯ ঃ অস্পষ্ট গ্রাম, পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ কাঠামো ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠন।

মজিদ, মুস্তফা ২০০১ ঃ "পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি"-বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ১৯৮৩ ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) মুক্তধারা, ঢাকা।

রউফ, জাহান আরা ২০০৪ ঃ বাংলাদেশে আদিবাসী, ঢাকা।

রায়, নীহার রঞ্জন ১৯৮৩ ঃ বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) মুক্তধারা, ঢাকা।

সাত্তার, আবদুস ১৯৬৬ ঃ অরন্য জনপদ, ঢাকা।

রহমান, হাবিবুর ১৯৮৮ ঃ সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ মোহাম্মদ ঃ বাংলাদেশ; ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।

হেনরী, মর্গান ১৮৭৭ ঃ প্রাচীন সমাজ, লন্ডন।

প্রশান্ত ত্রিপুরা, হারুন অবন্তী ২০০৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ, সেড, ঢাকা।

অভিসন্দর্ভ

ইসলাম, জাহিদুল ১৯৮৬ ঃ বাংলাদেশের একটি গারো গ্রাম-একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষন।

মুর্শেদ, সিকদার, ২০০২ ঃ বাংলাদেশের দশটি আদিবাসী ভাষা ঃ উদ্ভব ও ভাষা বৈশিষ্ট্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

দাস, প্রতিমা	ঃ	সিলেট জেলার খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সাহা, ভবানী	ঃ	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের রাজনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
হোসেন, মোশারফ	ঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইয়াসমিন, ফাতেমা	ঃ	বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

বোম শব্দের তালিকা

বাংলা শব্দ --- বোম শব্দ	
বাড়ী	In
গ্রাম	Khua
পানি	Tn
দেশ	Ram
বাজার	Bazara
দোকান	Doan
শিক্ষক	Masto
ভালবাসা	Zangfha
আমরা	Kanni
সে	Anni
তাদের	Annik
দিন	Ni
টাকা	Tangka
আকাশ	Van
ছাত্র	Ngaksia
বৃক্ষ	Thingkang
প্রধান	Lu
মহিলা	Nunau
লবন	Chite
বানর	Zawng
নদী	Tivak
ঝুম	Lao
হেডম্যান	Headman

বাংলা শব্দ --- বোম শব্দ	
বর্তমান	Tuhung
হাত	Kat
রক্ত	Tisen
পেয়ারা	Koizem
হৃদয়	Thinlung
পরিবার	Daungsung
শাকসব্জি	Annahsia
শেয়াল	Kawlwi
সমুদ্র	Tipe
অনুরক্ত	Maijale
মিষ্টিকুমড়া	Maipoi
সত্য	Dik
ভবিষ্যৎ	Mailei
শরীর	Tiksa
কনেপন	Man
অতিথি	Khual
পুরুষ	Munang
মাস	Thla
উৎসব	Powi
রাস্তা	Lampi
বাতাস	Thli
বই	Chabu
আমি	Kai

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা শব্দ --- বোম শব্দ	
তুমি	Nang
তারা	Annitha
নতুন	Kum
চাকরী	Chakri
ভগবান	Khusing
যৌবন	Tlanval
বাঁশ	Mau
চুল	Sam
বিবাহ	Umh
গীর্জা	Baiking
মরিচ	Marsia
হাতি	Sai
পোশাক	Puan
আম	Thaihai
ছবি	Thalakh
বৃষ্টি	Ruah
নারকেল	Daba
মন্দির	Biken
চক্ষু	Met
সন্তানাদি	Ngasia
তৈল	Tail
কবতুর	Vawk
সিংহ	Chikai

বাংলা শব্দ --- বোম শব্দ	
সীম	Bailap
আনারস	Lithi
বিশ্বাস	Lung
অতীত	Donglai
দাঁত	Ha
পা	Ke
কাঁঠাল	Nonun

(মাঠকর্ম)

Dhaka University Institutional Repository

বোমদের ঐতিহ্যবাহী মাচাংঘর

বোমদের গৃহে ঐতিহ্যবাহী পশুর মাথা

বোমদের ঐতিহ্যবাহী গৃহপালিত পশু রাখার ঘর

Dhaka University Institutional Repository

বোমদের বিখ্যাত বাঁশ নৃত্য

বোমদের জুম ভূমি

বোম অধ্যুষিত লাইমি পাড়ার গীর্জা

Dhaka University Institutional Repository

বধূবেশে বোম নারী

বোমদের বিয়ে

বোম মহিলা দ্বারা পরিচালিত দোকান

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত বোমদের গৃহে যীশু খৃষ্টের ছবি

ফারুক পাড়ার কবরস্থান

বোমদের মৃত দেহ বহন

Dhaka University Institutional Repository

বোমদের শবযাত্রা

মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বোম নারী পুরুষের ধর্মীয় গান পরিবেশন

ফাকুক পাড়ায় অবস্থিত শৈল প্রপাত

১১৮

Dhaka University Institutional Repository

বোমদের কোমর তাঁতে বস্ত্রবয়ন

মুঠোফোনে কথারত ফল বিক্রেতা বোম তরুণী

বোমদের শৌচাগার

Dhaka University Institutional Repository

বোমদের ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী অলংকারাদি

Dhaka University Institutional Repository

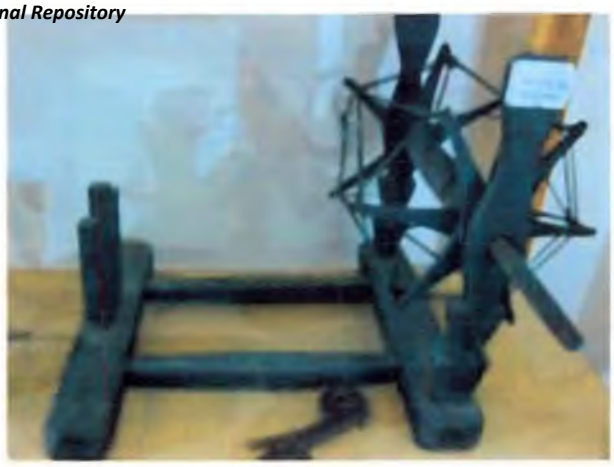

খোমাদের ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী হাতিয়ার ও তৈজসপত্র